

সূতনুকা একটি দেবদাসীর নাম
নারায়ণ সান্যাল



কৈফিয়ৎ

‘দেবদাসী’-প্রথা বর্তমানে নেই—অন্তত খাতা-কলমে। আইনের সাহায্যে মন্দির কারাগার থেকে তাদের মুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের আন্দোলনে সহস্রকের এই কু-প্রথাটি বর্তমান শতাব্দীতে আইন-মোতাধিক নিষিদ্ধ হয়েছে। সেদিন সারা ভারতে সে কী উল্লাস! আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ছোটখাটো সংস্করণ যেন! ভারতকে স্বাধীন করায় যেমন জবাহরলালকে ‘ভারতরত্ন’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল, এই ক্ষুদ্রতর স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল নায়িকা ডক্টর মিসেস মুখুলক্ষ্মী রেড্ডিকে তেমনি ‘পদ্মভূষণ’ খেতাব দেওয়া হয়েছিল। সে সম্মান তাঁর প্রাপ্য।

কিন্তু!

ভারত স্বাধীন হওয়ায় গোটা দেশটা যেমন মুক্তির স্বাদ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছিল—অন্নবস্ত্র-শিক্ষা-নিরাপত্তার অভাবে যেমন আমরা আজ আদৌ অনুভব করি না, মন্দিরের চার-দেওয়ালের রুদ্ধ কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ঐ দেবদাসীরাও কি তেমনিভাবে সব কিছু ফিরে পেল?

—সম্মান, মর্যাদা? স্বামী-সংসার-সন্তান?

ঠিক জানি না। খোঁজ নিচ্ছি। প্রশ্নটা আপাতত মগজে একটা যন্ত্রণার উদ্বেক করেছে; মনে হচ্ছে এ গ্রন্থের নাম হওয়া উচিত ছিল : ‘সূতনুকা এখন আর দেবদাসী নয়’—বা ঐ জাতীয় কিছু। আপাতত অতীত ইতিহাস হাতড়ে যেটুকু পেয়েছি তাই পরিবেশন করি। মুক্ত দেবদাসীদের সন্তান পেলে আপনাদের জানানো।

নানান গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, যা গ্রন্থ-শেষের নির্দেশিকায় উল্লেখ করে পূর্বসূরীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে।

এ কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে উনিশ শ’ তিরিশির পূজা-সংখ্যা যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল।

নারায়ণ স্যান্ড্যান

চৈত্র শেষ ১৩/৪/৮৫

আজ্ঞে হ্যাঁ, সূতনুকা শুধু ‘একটি দেবদাসীর নাম’ নয়, সূতনুকা ইতিহাস-স্বীকৃত প্রথম দেবদাসী। ‘দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা নারী’ — দেবদাসী বলতে যা বুঝি, তা আগে থেকেই ছিল, অনেক অনেক আগেকার যুগ থেকে ; কিন্তু ‘দেবদাসী’ শব্দটির সর্বপ্রথম ব্যবহার হয়েছে সূতনুকার ঐ সূতনু ঘিরেই। তার কাহিনীই আপনাদের আজ শোনাতে বসেছি।

কিন্তু মুশকিল কী জানেন? আমার তথ্যের ভাঁড়ে ভাবানী। কিছুই জানি না তার বিষয়ে। নামটা যদি সার্থক হয়, তবে ধরে নেওয়া যায় তার তনুদেহের প্রতিটি অঙ্গে ধরে ধরে সৌন্দর্যসম্পদ সঞ্চিত করেছিলেন পঞ্চশর। নামটা নিশ্চয় সার্থক। অজ্ঞতা-কোনাক-মহাবলীপুরমের অনেক অনেক নায়িকার মূর্তি মনের চোখে ভেসে ওঠে ঐ নামটা শুনলে— তব্বী, মধ্যক্ষাম, পকবিস্বাধরোত্তী! আমার পূজি মাগধী প্রাকৃতে রচিত একটি শ্লোক আর তার নিচে সরল গদ্যভাষে একটি স্বীকৃতি। বাস, ঐটুকুই আমার সম্বল, কাহিনীর উপাদান। ‘ব্রাহ্ম’ খেলব না আপনাদের সঙ্গে। প্রথমেই হাতের তাসটা টেবিলে বিছিয়ে দিই:

মধ্যপ্রদেশে সরগুজা রাজ্যে অনুচ্চ বায়গড় পাহাড়। পাশাপাশি দুটি অকৃত্রিম পর্বতগুহা—যোগীমারা আর সীতাবেড়া; কে বা কারা কোন যুগে ঐ অকৃত্রিম পর্বত গুহাকে ছেনি হাতুড়ির শাসনে গুহামন্দিরে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল তা জানি না। ভগ্নস্থপ দেখে মনে হয় বৌদ্ধ-গুহা নয়, অর্থাৎ ভাজা-কান্হেরী-অজ্ঞতা-নাসিক-এর সমগোত্রীয় নয়; ও দুটি পৌরাণিক হিন্দু মন্দির। কিন্তু রূপদক্ষের দল বৌদ্ধ শিল্পসৌকর্যে অভ্যস্ত। পাহাড়ের গায়ে ‘বাস-রিলিফ’-এ (অর্ধ-উৎকীর্ণ প্রস্তর) যে ভাস্কর্য—মহাকালের পরুষ হস্তাবলেপনে ক্ষতবিক্ষত মূর্তিগুলি—ভারহুত-সাঁচীর ঢঙে। সেই বংশীবাদিকা-বীণারপ্রি়ুনী-নৃত্যরতা অঙ্গরা-গন্ধর্ব দেবদাসীর দল। উপরের খিলানে দুর্বোধ্য হরফে কী-যেন লেখা। পণ্ডিতেরা তাই নিয়ে যুগে যুগে তর্কবিতর্ক করেছেন। ভারততত্ত্বের স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যাসম’ শ্লোকটির ইংরেজী তর্জমা করেছেন:

“Poets, the leaders of Lovers,
Light up hearts which are
Heavy with passion,
She who rides on a seesaw,
The object of jest and blame,
How can she have fallen so deep in love
As this?”

অনুবাদে যা দাঁড়ায় :

কবি, নগর-নাগর-নৃপতি

জ্বালিয়ে তোলে অন্তর, নিরন্তর রিরংসা-জর্জরিত।

কৌতুক-কর্দম-ক্লিশিত ঐ যে মেয়েটিকে

নাগরদোলায় দোলায়

ও কেমন করে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেয়

এমন গভীর —সুগভীর প্রেমে?

এবং তারপরেই সহজ সরল গদ্যভাষে একটি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি : ‘সুতনুকা নাম দেবদাসিকী তং কাময়িত্ব বালানশেষে দেবদিস্নে নাম লুপদক্থে।’

তার অর্থ নিয়ে নানা মূনির নানা মত। এম. বয়ার তার আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন “Sutanuka by name, Devadasi. The excellent among young men loved her, Devadinna by name, skilled in sculpture” টি. ব্লচ-এর মতে আক্ষরিক অনুবাদটা হওয়া উচিত : Sutanuka, by name, a Devadasi made this resting place for girls. Devadinna by name, skilled in painting.” দ্বিতীয় অনুবাদটা কিছুতেই মানা চলে না। —‘কাময়িত্ব’ শব্দটির অনুবাদ না থাকায়। ব্যাসম নিজে ঐ পংক্তিটি অনুবাদের চেষ্টা করেননি; তাঁর মহাগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্ট: “Sutanuka, the slave-girl of the gods, loved the excellent young man Devadinna, the artist.” অর্থাৎ সুতনুকা নামের জনৈক দেবদাসী তরুণ শিল্পীচুড়ামণি দেবদিস্নকে ভালবেসেছিল।

বাস্! এটুকুই আমার পূজি!

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? বয়ার সাহেবের মতে দেবদিস্ন সুতনুকার প্রেমে পড়েছিল, অথচ পুরাতত্ত্ব বিভাগের মতে সুতনুকা দেবদিস্নের প্রেমে পড়েছিল। কোন্টো সত্য? জানি মশাই জানি, আপনি যা বলতে চাইছেন সেটাও ভেবে দেখেছি আমি —খঞ্জনী যখন বাজে তখন একা বাজে না, কে কাকে বাজায়, এ প্রশ্নটাই বাহুল্য। ওরা একে অপরের স্পর্শে রোমাঞ্চিততনু হয়! সেই কম্পনই যখন শব্দভরস্বে তোমার-আমার শ্রুতিতে ধরা দেয় তখন আমরা বলি—খঞ্জনী বাজছে!

কিন্তু সত্যই কি তাই? ‘প্রেমে পড়া’ আর ‘প্রেম লাভ করা’—প্রেমের দুনিয়ার কর্তৃবাচ্য-কর্মবাচ্য কি একই মুদ্রার ‘হেড অর টেইল’? মূল্যমানের তাতে হেরফের হয় না? আমি কিন্তু তা মানতে রাজি নই। দেবদাসী ক্ষণিকবাদী, প্রেমজীবিনী — তাকে প্রহরে-প্রহরে প্রেমে পড়ার অভিনয় করতে হয়, সেটাই তার পেশা। প্রতি রাত্রে নিত্য নতুন নাগর। অভ্যাসবশে অজানা অচেনা পুরুষকে সে সন্ধ্যারাত্রে তুলে নেয় হাতে, মধ্যরাত্রে মুক্তগৃহী নীবিবন্ধের মেথলায় অভ্যাসবশেই তাকে স্পর্শ করায়, দেবদাসী ২

ভোর রাতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অভ্যস্ত অবজ্ঞায় ‘পরশপাথর’ খুঁজে ফেরা খ্যাপার মতো। তারপর বর্ষণমুখর কোন এক নির্জন নিশীথে যদি সেই অলসকন্য়ার নজরে হঠাৎ ধরা পড়ে—কটিবন্ধে নিকষিত হেমের স্বর্ণাভা, তখন সে কী করবে? কেমন করে খুঁজে পাবে সেই অবজ্ঞায়-ছুঁড়ে-ফেলা পরশ পাথর? তাই তার জীবনে অনেক—অনেক বড় জাতের প্রাপ্তি, যদি সে তার মুঠিতে ধরতে পারে তরুণ শিল্পীর একান্ত প্রেমকে!

তা সে যাইহোক, সুতনুকার কাহিনী লিখতে বসে উপাদান পেয়েছি ঐটুকুই। স্থান-কাল-পাত্র চিহ্নিত; তার বেশী কোনও তথ্য নেই। তথ্য থাক না থাক, সত্য আছে। ঐ অজ্ঞাত কবির শ্লোকাঙ্কটিকেই বিশ্লেষণ করে দেখা যাক :

কবি বলেছেন, মেয়েটি নাগরদোলায় দোলে। উভয় অর্থই। চক্রাবর্তনের পথে কখনও উঠে যায় উদ্ভাস্ত প্রেমের শীর্ষবিন্দুতে—আদরে সোহাগে ‘কমপ্লিমেন্টস’—এ সে তখন প্রাপ্তির সপ্তমস্বর্গে; তখন সে নগর-নাগর-নৃপতিদের লালসাজর্জর কামনার ধন। কবি তখন তার রূপবর্ণনায় অভিধান হাতড়াতে ব্যস্ত। বাৎস্যায়নের^১ মূল্যায়নে তখন সে নৃপতি-শ্রেষ্ঠী-মহাপণ্ডিতদের সমপংক্তিতে উপবিষ্টা হবার মর্যাদাসম্পন্না।

কিন্তু তারপর? নাগরদোলার সেই শীর্ষবিন্দুতে ক্ষণিকবাদিনী স্থাবর নয়। পরমুহূর্তেই শুরু হয় তার অধঃপতন। নামতে-নামতে-নামতে সে এসে উপনীত হয় সমাজের নিম্নতম ‘নাদির’-এ! তখন সে শুধু কৌতূকের শিকার, কর্মমপক্ষে ক্রোধান্তনু। জেরুসালেম অধিবাসীদের মধ্যে তখন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়—কে ঐ ভ্রষ্টা রমণীকে লোষ্ট্রাঘাতে প্রথম ভূতলশায়িনী করবে!

এমন একটি বিচিত্র মেয়ে কেমন করে পড়ে অমন প্রেমে? অমন গভীর—সুগভীর প্রেমে? জানি না। ইতিহাস জানে না। তবে কথাসাহিত্যিক হিসাবে আমাকে যদি ছাড়পত্র দেন, তাহলে কল্পনায় গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে পারি: রূপদক্ষ দেবদিল্লের প্রভায় প্রোজ্জ্বল সুতনুকার প্রেমকাহিনী।

কিন্তু তার আগে জেনে নিতে হবে—‘দেবদাসী’ কে? ‘নাগর দোল’ কী? এবং ‘দেবদিল্ল’ কেন?

‘দেবদাসী’ প্রথার মূলে প্রবেশ করতে হলে আমাদের জ্ঞানা দরকার ‘পতিতাবৃত্তি’-র আদিকথা। কারণ দেবদাসী বাস্তবিকপক্ষে পতিতারই এক শর্করামণ্ডিত সংস্করণ। এবং প্রসঙ্গত : দাসপ্রথা ; যেহেতু ‘দেবদাসী’ ঐ দাসপ্রথারও এক বিচিত্র রূপান্তর।

দাসপ্রথা এসেছে ইতিহাসের উষামুহূর্তে। মানুষ যেদিন শিকার ও ফলমূল আহরণ ছেড়ে জমি চাষ করতে শিখল, যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করে গড়ে তুলল জনপদ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাজপুরোহিত-তন্ত্র, তখন থেকেই দাসপ্রথার শুরু। বিজয়ী জনপদনৃপতি

বিজিত রাজ্যের মানুষকে নিয়োগ করলেন দাসরূপে—পুরুষকে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানে এবং নারীকে বিনা-প্রতিবাদে দেহদানে বাধ্য করা হল।

সময়ের মাপকাঠিতে পতিতাবৃত্তি বোধকরি দাসবৃত্তির চেয়ে প্রাচীন। এন্সাইক্লোপিডিয়া বলছেন, “কোনও কোনও প্রাক-মানব জীবকে (primates) যৌনতা বহির্ভূত প্রয়োজনে (non-sexual purposes) যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতে দেখা যায়। স্ত্রী-শিম্পাঞ্জী বা স্ত্রী-বেবুনকে দেখা গেছে খাদ্যের প্রয়োজনে পুরুষকে আকৃষ্ট করতে। দেহদানে পুরুষকে সন্তুষ্ট করার পর পুরুষ যখন তৃপ্তি ও ক্লান্তিতে হাঁপাতে থাকে তখন পুরুষজন্তুর সংগৃহীত খাদ্যে সে ভাগ বসায়। সুতরাং স্ত্রীলোকের পক্ষে আহাৰ্য সংগ্রহ মানসে (যা নাকি পতিতাবৃত্তির মৌল প্রেরণা) দেহদানের প্রচেষ্টা ‘মানুষ’ নামক জীবের চেয়ে প্রাচীন—প্রাকমানব-জীবদের ঐতিহ্যবাহী।”³

একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতো। মানবেতিহাসের একেবারে উষা যুগ থেকেই বিভিন্ন সভ্যতায় ঐ দেবদাসীপ্রথার নানান রকমফের দেখা যায়। এবং আরও বিশ্বয়ের কথা, সে-প্রথা রাজতন্ত্র-যেঁষা, নয়, পুরোহিত-তন্ত্র যেঁষা। রাজার প্রাসাদে সর্বদা-দেহদানে-প্রস্তুত উপপত্নী, দাসী বা গণিকা অপ্রত্যাশিত নয়; কিন্তু মন্দিরে তারা এল কেমন করে? কেন? একটি সভ্যতায় নয়; প্রাচীনকালের প্রায় প্রত্যেকটি সভ্যতায়। আর চূড়ান্ত বিষয়—তারা পতিতা নয়!!

কারণ ‘পতিতা’ শব্দটার আভিধানিক⁴ অর্থ : ‘অর্থের বিনিময়ে যে দেহদান ব্যবসায়ে লিপ্ত’ এরা পতিতা নয় তিনটি যুক্তিতে। প্রথমত : এরা অর্থের বিনিময়ে মন্দিরে গিয়ে দেহদান করত না ; দ্বিতীয়ত : এরা সামাজিক বিধান মেনেই মন্দিরে সমবেত হত এবং সর্বোপরি, মন্দির থেকে দেহদান করে বেরিয়ে এসে এরা নির্বিবাদে সমাজে মিশে যেত—কারও স্ত্রী, কারও বা মা হয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করত। সর্বস্বরের স্ত্রীলোকই।

এই প্রাচীনতম প্রথার তিনটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা গেছে। প্রথম প্রথায়, যৌবনোদগমের পর কুমারী অবস্থায় তাদের মন্দিরে যেতে হত আদিরসের প্রথম পাঠ নিভে—মাত্র এক রাতের জন্য। দ্বিতীয় প্রথায়, তাদের মন্দির চত্বরে বেশ কিছুদিন যৌনজীবনের আদি পাঠ নিয়ে অভ্যস্ত হতে হত—কোথাও কয়েক সপ্তাহ, কোথাও বা কয়েক মাস। দুটি ক্ষেত্রেই মন্দির থেকে ফিরে এসে তারা বিবাহ করত, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর-করণা করত। কেউ আপত্তি করত না। কারণ ব্যবস্থাটা ছিল সার্বজনীন। আজকের সতীত্বের ধারণায় সেই সমাজের মানসিকতাটা প্রণিধান করা শক্ত। একটা তুলনামূলক আলোচনা আমাদের সহায়ক হতে পারে। পশ্চিমখণ্ডে ‘ডেটিং’ একটা স্বীকৃত প্রথা। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মেয়েরা পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষ্যভ্রমণে যায়, ফিরে আসে রাত করে। নির্জনে তারা কী করে কেউ জনতে চায় না। শুনেছি, সে দেশে মায়েরা দেবদাসী ৪

এই পর্যায়ে মেয়েদের ‘পিল’ খেতে শেখায়। ফলে, এই সার্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থাটা সেখানে স্বীকৃত। ভারতীয় সমাজ অতটা অগ্রসর—বরং বলি ‘অতি আধুনিক’ নয়। এখানে অন্য জাতের তুলনামূলক উদাহরণ দেওয়া চলে। আমাদের সমাজে, স্ত্রীকে কোনও গাইনকলজিস্ট দিয়ে পরীক্ষা করানো। স্ত্রীর যৌনাঙ্গ পরপুরুষে দেখেছে বলে কোন স্বামীই ক্ষুব্ধ হয় না, স্ত্রীও লজ্জায় মুখ লুকায় না।

তৃতীয় প্রথায়, কুমারী মন্দিরে যায়, আর ফিরে আসে না। সারাজীবনের জন্য দেবদাসী হয়ে যায়।

প্রথম প্রথাটির প্রাচীনতম নিদর্শন হেরোডোটাস^১-এর বর্ণনায়। ব্যাবিলনের মিত্রা-মন্দির প্রসঙ্গে ইতিহাসকার লিপিবদ্ধ করেছেন— “ব্যাবিলেনীয়দের মধ্যে একটা লজ্জাকর প্রথা আছে। ব্যাবিলনের প্রতিটি রমণীকে জীবনে একবার অন্তত (রতি) মন্দিরে উপস্থিত হতে হবে এবং মন্দিরের অলিন্দে সার দিয়ে বসতে হবে। অজ্ঞানা অচেনা পুরুষদল ঐ অলিন্দ দিয়ে পদচারণা করবার অবকাশে রমণীদের ভিতর এক-একজনকে পছন্দ করে তার কোলে একটি রৌপ্যমুদ্রা ফেলে দেবে। কে দিল, তা ফিরে দেখবার অধিকার মেয়েটির নেই। যে তাকে পছন্দ করল তার হাত ধরে মেয়েটিকে চলে যেতে হবে মন্দির-চত্বরের বাহিরে নিভৃত-নিকুঞ্জে। সেখানে সেই অপরিচিতকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমেই মেয়েটি রতিদেবীর প্রাপ্য অর্ঘ্য মিটিয়ে দেবে। তারপর সে ফিরে যাবে নিজের সংসারে—সংসারধর্ম করতে। ঐ প্রথম রাতের পর আর কোনভাবেই মেয়েটিকে সতীত্ব থেকে টলানো যাবে না।”^২

ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ খোলাখুলি বলেননি—ব্যাবিলনের রমণী কি কুমারী অবস্থায় রতি-মন্দিরে আসত, অথবা জীবনের যে কোন পর্যায়ে। কিন্তু ফিনিশীয় সভ্যতার হেলিওপোলিস্-এর মন্দিরে সমবেত হত তুমহাত্তে অক্ষতযোনি কুমারীর দল : তারা তাদের কৌমার্যদান করে বিবাহিত জীবন যাপনের অনুমতি লাভ করত^৩। তুমহাত্তাগরের পূর্ব-উপকূলে সিরিয়ার রতি-মন্দিরে এই প্রথা দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের প্রারম্ভে কঙ্গতাজউইন সেই রতি-মন্দিরটি তুমিস্যাৎ করে সেখানে একটি গীর্জা নির্মাণ করিয়ে এ প্রথা আইনত রদ করিয়েছিলেন।^৪

লিডিয়ার রতি-মন্দিরেও কুমারীবলির প্রথা বিদ্যমান ছিল— কিন্তু সেখানেও সেটা ছিল এক-রক্তনীর দুষ্প্রপ!

কিন্তু আর্মেনিয়া অথবা পারস্যে এক রাত মজুরি মেটানো যেত না। হতভাগিনীদের প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল সেখানে দেবদাসীর তুমিকায় বন্দিनी হয়ে থাকতে হত। একাধিক পুরুষ কর্তৃক দীর্ঘকাল ধর্ষিতা না হলে তার মুক্তি নেই! “সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এবং রাজা-রাজড়ার দলও নিজ নিজ কন্যাকে ঐ রতি-মন্দিরে প্রেরণ করতে বাধ্য ছিলেন। সেখানে একাধিক অপরিচিত পুরুষকে দেহদানে ধন্য করে

স্ট্রীলোকেরা পুরোহিতের অনুমতিপত্র হাতে নিজ নিজ পরিবারে ফিরে আসতেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের বিবাহ হত এবং ঐ দৈহিক দেবপূজার জন্যে কেউ তাঁদের ঘণার চোখে দেখতেন না।^৪”

সিরিয়ার তাম্বুজ-মন্দিরে ছিল এই প্রথার এক অদ্ভুত রকমফের। সেখানে এক লৌকিক দেবতার উপকথা আশ্রিত মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম ঘিরে একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান হত বসন্তকালে। উপকথার সারাংশটি এই রকম : পাতা-ঝরার দিনে পৃথিবীর মৃত্যু হয় ;—‘Autumn, a Dirge’—দেব তাম্বুজ ভূতলশায়ী হন, তাঁর বার্ষিক মৃত্যু হয়। কিন্তু তখনই ঘটে বসন্তের শুভাগমন। বিরলপত্র বৃক্ষে দেখা দেয় কিশলয়—ফলের বাহার অন্তরাল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। প্রেমের স্পর্শে মৃতদেহে হয় নবজীবনের সঞ্চার। মদনোৎসবের ঐ চিহ্নিত দিনে নাগরিকের দল সমবেত হয় মন্দির চত্বরে। তারা বুক চাপড়ে কঁাদতে থাকে। তারপর কে যেন হেঁকে ওঠে : তাম্বুজ জীবিত! ঐ তো তিনি! তাঁকে বৃকে টেনে নাও—

রোদনক্লান্তা রমণীর দল কান্না ভুলে ছুটে আসে—ধরা দেয় অপেক্ষমান পুরুষদের কবাটবৃক্ষে। বাস্তবে সামাজিক শাসনকে বছরে একদিন শিথিল করা হয় মাত্র। এই উৎসবের একটি রকমফের মধ্যযুগের ভারতবর্ষের মদনোৎসবের মধ্যে বিধৃত হয়েছিল বলে শরদিন্দু বর্ণনা করেছেন—“মদনোৎসবের কুকুম-অরুণিত সায়াহ্নে উজ্জয়িনীর নগর-উদ্যানে মদনোৎসবে....একদিনের জন্য প্রবীণতার শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। অবরোধ নাই, অবগুষ্ঠন নাই— লজ্জা নাই। বৌবনের মহোৎসব। উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা দুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুলচরণা নাগরিকের মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্বৃত অঞ্চল উড়িতেছে, অসব-অরুণ নেত্র ঢুলুঢুলু হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কলহাস্য করিয়া কুকুমপ্রলিপ্তদেহা নাগরী এক তরুশুম্ম হইতে গুল্মান্তরে ছুটিয়া পলাইতেছে.....পশ্চাতে পুষ্পের ক্রীড়াধনু হস্তে শবরবেশী নায়ক তাহার অনুসরণ করিতেছে। কঙ্কণ, নূপুর, কেশুরের কনংকার, মাদলের নিকশ, লাস্য-আবর্তিত নিচোলের বর্গচ্ছটা, স্থলিত কণ্ঠের হাস্য-বিজ্ঞপ্তিত সঙ্গীত, নির্লজ্জ উন্মুক্তভাবে কন্দর্পের পূজা চলিয়াছে।”^৭

আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ফিনিশীয় এবং কার্থেজ সভ্যতাতেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সেখানেও সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ তাদের কন্যাদের (রতি-) দেবীর মন্দিরে প্রেরণ করত। স্বামীর অঙ্কশায়িনী হবার পূর্বে তাদের হাতে হত অজ্ঞানা অমৃত পুরুষের শয্যাসজিনী।^{১০}

আশা করা স্বাভাবিক যে, এই প্রথার কোন একটি উৎস ছিল এবং তা ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সভ্যতায় সংক্রামিত হয়েছে—বশিক, পর্যটক, রাজপ্রতিনিধি বা দিগ্বিজয়ীদের কল্যাণে। কিন্তু এটাই যে ধ্রুব সত্য তা না-ও হতে পারে। কয়েকজন পণ্ডিত যুক্তি-দেবদাসী ৬

তর্ক দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, একই জাতের প্রথা বিভিন্ন সমাজে উদ্ভূত হয়েছে পরস্পরের সাহায্য ছাড়াই—হয়তো একই অন্তর্লীন প্রেরণার উৎসমুখ থেকে। সে যুগের প্রতিটি সভ্যতাতেই আছেন এক-একজন প্রেমের দেবতা ও দেবী। শুধু প্রেমের নয়, রতিরঙ্গ-রসের! মদন ও রতি। ব্যাবিলনে তাম্বুজ-ইশতার, গ্রীসে ডায়োনিশাস-আফ্রোদিতে, রোমক সভ্যতায় ব্যাকাস-ভেনাস। ঐ যৌন-তথা-মদিরা উৎসবের হেতু নির্ণয়ে, অর্থাৎ পরোক্ষভাবে দেবদাসীপ্রথার মূল কারণ নির্ণয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গের যুক্তিতর্ক ঘেঁটে আমি ছয়টি মৌল হেতুর সন্ধান পেয়েছি। তাদের আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

১। ধর্মীয় প্রেরণা :

ক. উর্বরতাচার

খ. বলিদান প্রথা-ভিত্তিক

গ. কুমারী-তত্ত্ব

২। সমাজনৈতিক প্রেরণা :

ক. যৌথ যৌনাচারের উদ্ভারাক্ষিকার

খ. আতিথেয়তার ফলক্রটি

গ. পুরোহিত-তত্ত্বের ব্যাভিচার

একে একে তৌল করে দেখা যাক :

১। ধর্মীয় প্রেরণা :

ক. উর্বরতাচার : উর্বরতার বিষয়ে নানান লোকচিত্র সভ্যতার একেবারে আদিযুগ থেকে লক্ষ্য করা গেছে। লিঙ্গপূজা ও মাতৃতন্ত্র মানুষের আদিম ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। লিঙ্গ ও যৌনি-প্রতীকী পোড়ামাটির নানান লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি ব্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ থেকেই পাওয়া গেছে—কুল্লি, যোয়াব অথবা হড়প্পা সভ্যতায়।¹¹

প্রজন্ম-তত্ত্বের আদিম প্রেরণাটিকে মানুষ সংগোপন করেছে। সেই গোপনীয়তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে মিশ্রিত হয়েছে কিছুটা বিশ্বাস, কিছুটা কৌতুহল। প্রকৃতির যা কিছু চমকপ্রদ তাতেই সে তখন দেবত্ব আরোপ করছে—সূর্য-চন্দ্র-পবন-অগ্নি সবই দেবত্বমণ্ডিত। জীবজগতের সঙ্গে মানুষ্যসভ্যতার মৌল পার্থক্য এই প্রজন্ম-তত্ত্বে—যৌনক্রিয়াকে সংগোপনে রাখার নির্দেশ। ফলে তাতেও আরোপ করা হল দেবত্ব। যেহেতু এ তত্ত্বের বৈতন্স্বরূপ আবশ্যিক, তাই শুধু দেব নয় এলেন দেবীও। হড়প্পা-সভ্যতায় প্রাপ্ত প্রোটোশিব-এর বিবর্তনে এলেন গৌরীপট্টবিধূত শিবলিঙ্গ, অন্যান্য সভ্যতায় তাম্বুজ-ইশতার, ডায়োনিশাস-আফ্রোদিতে, ব্যাকাস-ভেনাস। একজগতের পণ্ডিতের বক্তব্য—এই দেবদেবীর পূজার নৈবেদ্য হচ্ছে কুমারী নারীর আত্মদান। এ থেকেই এ প্রথার জন্ম।

এই প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য আপাতত অনুজ্ঞ রেখে যাচ্ছি—কীভাবে ‘ম্যাডেনা’ রূপান্তরিতা হলেন ‘ভেনাস’-এ। কারণ সেটা সুতনুকার নয়, দেবদ্বন্দ্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। শিল্পের অনুভাবনার সে বিবর্তন আপাতত উহ্য থাক, কারণ আমরা আছি—ভাস্কর্যের নয়, তার মডেল-এর প্রসঙ্গে।

খ. বলিদান প্রথা : প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ যখন নব্যপ্রস্তর যুগের উত্তরণে অপেক্ষমান, যাযাবার বৃত্তি ছেড়ে যখন সে কৃষিনির্ভর হতে চাইছে, গৃহপালিত পশুর প্রবর্তন করছে ; সেই আদিম যুগে উদ্ভূত হয়েছিল ‘বলি’-প্রথা। বলিদান প্রথা শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিভিন্ন সভ্যতায় অনুপ্রবেশ করেছে। দক্ষিণ আমেরিকার মায়া ও আজ্‌তেক সভ্যতায় তা অতি বীভৎস আকার ধারণ করে। দেবতাকে তুষ্ট করতে হলে কোন কিছু বলি দিতে হবে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এ-প্রথার মূলে আছে প্রাক্‌মানব জীবদের সময় থেকে প্রচলিত বিনিময় প্রথা। প্রাচীন প্রস্তরযুগের কোনও প্রায়মানব প্রতিবেশীর শিকারে ভাগ বসাতে চাইলে বিনিময়ে তাকে দিতে হত কোন কিছু—হয়তো পাথরের একটি শাণিত ফলা অথবা জন্তুর চামড়া। স্ত্রীলোকে খাদ্যের বিনিময়ে যে দেহদান করত এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। এমনকি পুরুষ তার অধিকারভূক্ত নারীদেহ—স্ত্রী ও কন্যার দেহ—বাদ্য সংগ্রাহের প্রয়োজনে বিনিময় পণ্য হিসাবে দেখত—অর্থাৎ যে-যুগে স্ত্রী ও কন্যার সংজ্ঞা চিহ্নিত হয়েছে। হয়তো সেই আদিম বিনিময়ের প্রেরণা থেকেই সভ্যতার উদ্যোগে—সুমেরীয়, মিশরীয়, আসিরীয় বা ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় মানুষ স্থির করেছিল, বংশরক্ষার প্রয়োজনে দেবতার কাছে সন্তান প্রার্থনা করার পূর্বে বিনিময় প্রথায় দেবতাকে দিতে হবে স্ত্রী ও কন্যার দেহ।

গ. কুশারী-তত্ত্ব : কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই অদ্ভুত প্রথার প্রচলন গোষ্ঠী-সচেতনতা থেকে। এক গোষ্ঠীভূক্ত মানুষ যাতে পরস্পরের মধ্যে মারামারি না করতে পারে সে-বিষয়ে গোষ্ঠীপতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! অন্তর্কলহের পরিণতি হিসাবে কেউ যদি স্বগোষ্ঠীর করণ্ড রক্তপাত ঘটায় তবে তার কঠিন শাস্তি হত। এ কানুন অতি আদিম যুগ থেকে বহাল—যখন মানুষ প্রথম গোষ্ঠীভূক্ত হতে শিখছে, প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার পথ খুঁজছে।

স্যালমন রাইনাচ বলেছেন ¹², “নরনারীর প্রথম যৌনমিলনে নারীঅঙ্গের কিছুটা রক্তপাত অনিবার্য ; তাই মানুষ সেই আদিম যুগেই স্থির করল: স্বগোত্রের নরনারীর বিবাহ অবিধেয়। যদি এ রক্তপাত কলহ-হৃন্দের পরিণতি নয়, কোমলাঙ্গীর কাম্য, তবু বাহ্যত এ কাজ সহস্রাবীর ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এ থেকেই স্বগোত্র বিবাহ হল নিষিদ্ধ।” স্বগোত্র ও স্বগোষ্ঠীর এই ধারণাটা ভিন্ন দেশকালে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে।

কেউ কেউ হয়তো বললেন, “বাপু হে, স্বজাতির মধ্যে বিবাহে তোমাদের আপত্তি ঐ প্রথম রাত্রির রক্তপাতের জন্য তো? বেশ তো শুধু সেইটুকু দায়িত্ব ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্তের কাউকে দিলেই হয়।” একদল পণ্ডিতের মতে এইটাই বিভিন্ন সভ্যতায় রতিমন্দিরে কুমারী কন্যাদের প্রেরণের প্রেরণা। অর্থাৎ প্রথম রক্তক্ষরণের অপরাধ ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্তের স্বন্ধে চাপানো। মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে একস্থলে মধ্য-এশিয়ার একটি বিচিত্র সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে পথপার্শ্বের পাছশালায় আশ্রয় পাওয়া বিদেশী পাছকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হত কিছু আঞ্চলিক সমস্যা মিটিয়ে দেবার জন্য। বিনিময়ে পথিককে দেওয়া হত কিনামূল্যে আহার, আশ্রয়, এমনকি পারিশ্রমিক। সমস্যাটা কী? স্থানীয় কিছু প্রাপ্তবয়স্ক কুমারীকে বিবাহের উপযুক্ত করে তোলা। হয়তো সেই কুমারী মেয়েটি স্থানীয় কোন যুবকের প্রেমে পড়েছে, অথবা পাত্রপক্ষ-কন্যাপক্ষ উভয়েই সম্মত হয়েছে—কিন্তু যতদিন না কোনও ভিন্দেবী পাছ মিলনের প্রাথমিক অন্তরায়টা অপনোদিত করে দিচ্ছে ততদিন বিয়ের ফুল ফুটবে কী করে? গ্রাম-বৃদ্ধদের সনির্বন্ধ অনুরোধ বেচারি পাছ এড়াতে পারে না। একের পর এক কনে বাড়িতে যায় আর উদ্ভিন্নযৌবনা কুমারী কন্যাদের বিবাহের উপযুক্ত করে, রক্তপাতের অভিশাপ নিজ মাথায় ধারণ করে ফের পথে নামে। মার্কোপোলো সখেদে বলেছেন: কখনও কখনও এজন্য পথিকের বিলম্বও হয়ে যেত, কারণ একই রাতে অতগুলি কুমারীকন্যাকে বিবাহের উপযুক্ত করে তোলার দৈহিক ক্ষমতা হয়তো যাত্রীর নেই!

এই কুলাচারটি এক এক দেশে এক এক রূপ নিয়েছে। কোথাও নিয়মটা হয়েছে এই রকম—রক্তপাতের সত্তাবনা এবং মিলনপথের প্রথম বাধাটি অপসারণ করবে—বর ভিন্ন বরযাত্রীদের যে কোন যুবক। পশ্চিম আফ্রিকার এক আদিম আরণ্যক সম্প্রদায়ে যে বীভৎস প্রথাটি এ যুগেও প্রচলিত তার বর্ণনা দিচ্ছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী পর্যটক¹³, “বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হলে কনে বরের ঘরে শুতে যেতে পারবে না। বরযাত্রীরা সকলে ধরাধরি করে নববধূকে চিত করে শুইয়ে দেবে এবং বর স্বয়ং তার দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধরবে কনের মাথাটা। বসবে তার শিরেরের দিকে হাঁটু গেড়ে, কনের দুই হাত মাটিতে চেপে ধরে। বরযাত্রী দলের প্রত্যেকটি পুরুষ অন্তঃপাতি উদ্ভাস নৃত্যগীতের আসর জমাবে এবং একে একে ঐ নিরুপায় নববধূতে উপগত হবে। সব অনুষ্ঠান শেষে বর স্বয়ং অচৈতন্য উলঙ্গ নারীদেহটা উঠিয়ে নিয়ে যাবে।”

এই ‘টাবু’ বা কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে প্রচলিত হয়েছিল একটি ব্যাপকবীভৎস প্রথা: ‘প্রথম রাত্রির অধিকার’। সুযোগ নিয়েছিল, বলা বাহুল্য গোষ্ঠীপতি, পুরোহিত এবং ভূম্যধিকারীর দল। এ প্রথা মধ্যযুগেও বিভিন্ন তথাকথিত সভ্যসমাজে প্রচলিত ছিল—ফ্রান্সে, জার্মানিতে এবং ইংল্যান্ডে। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা অ্যাংগেলস বলেন,¹⁴ “উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—আরাগানে এই কুলাচার সাম্প্রতিককালেও

প্রচলিত ছিল। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফার্ডিনান্ড দ্য ক্যাথলিক আইন করে এই প্রথা রদ করেন। সেই ঐতিহাসিক সনদটি উদ্ধার করা গেছে। তাতে বলা হয়েছে, অতঃপর এই আইন গৃহীত ও ঘোষিত হইল যে, উপযুক্ত কর্তামশাইয়েরা (সেনর, ব্যারন, ভূম্যধিকারী) প্রথম রাত্রির অধিকারচ্যুত হইলেন। অর্থাৎ কোন কৃষক বা গ্রামবাসী বিবাহ করিলে তাহার নববধূটিকে প্রথম রাত্রি অতিবাহনের জন্য কর্তামশাইয়ের ভদ্রাসনে প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে না।” পতিতাবৃত্তি বিষয়ে যিনি মৌলিক গবেষণা করেছেন সেই ডক্টর আরিথ্ লিখেছেন ¹⁵, “প্রথম রজনী উপভোগের এই ব্যবস্থাটি মধ্যযুগে গোষ্ঠীপতি ও নৃপতিগণের করায়ত্ত ছিল যে ভূ-খণ্ডে, তাহার বিস্তৃতি বিস্তারক—ব্রাজিল হইতে গ্রীনল্যান্ড এমনকি সুদূর ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ।”

এবং এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের কোনও কোনও অঞ্চলে গ্রাম্য বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলে নববধূকে নিয়ে বর উপস্থিত হত কর্তামশায়ের বাগান বাড়িতে—দেউড়ি পার করে দিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকত ষিড়কির দরজায়, প্রভাতের প্রতীক্ষায়। তোর রাতে পাইকের পিছন পিছন ষিড়কি দিয়ে মেয়েটি বেরিয়ে আসত ; কিস্বা সদর দরজাতেই কখনও বা কর্তামশাই স্বয়ং মেয়েটির হাত ধরে বেরিয়ে আসতেন। মদমস্ত কণ্ঠে বলতেন, বেশ সুন্দর বউ হয়েছে রে তোর। ঘরে নিয়ে যা এবার। গুরুপ্রসাদী করে দিয়েছি।

২। সমাজনৈতিক প্রেরণা—

ক. বৌদ্ধ যৌনাচারের উদ্ভাবিকার : এই মতের প্রবক্তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য অ্যাংগেলস্-এর অভিমত। তাঁর মতে ¹⁶ —ভৌগোলিক সীমানা-নিরপেক্ষ সমগ্র মানব সমাজকে তিনটি কল্পে (epoch) বিভক্ত করা যায়। যথা: জংলী (Savage), বর্বর (Barbaric) এবং সভ্য (Civilized)। ঐ মতে প্রথম কল্পের শুরু পর্যন্ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর পূর্বে, মানুষ যখন নিয়েনডারথাল পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হল; শেষ হয়েছিল—তীর-ধনুক আবিষ্কারের ক্রান্তিকালে। বর্বর-যুগের প্রারম্ভ পোড়ামাটির তৈরীস ব্যবহার থেকে, সমাপ্তি—লৌহ আবিষ্কারে। ঐ দুটি প্রথম-দ্বিতীয় কল্পে ‘বিবাহ’ বলে কোনও ধারণা ছিল না। সে সমাজে না ছিল কেউ বহু-পত্নিক, না কেউ বহু-পত্নিক। তার ভিত্তি বৌদ্ধ-বৌদ্ধজীবনে। কিন্তু তা বলে তা জীবজগতের মতো বাঁধন-ছেঁড়া নয়। হয় তা ‘কনস্যাঙ্গুইন’ (Consanguine) অথবা ‘পুনালুয়ান’ (Punaluan)। জীবজগতের সঙ্গে এ দুটি প্রকার পার্থক্যটা কী? জীবজগতে—মাছ-পাখি-ভন্যপায়ী অন্যান্য জীব কোনও বাঁধন না মেনে মিলিত হয়। তাদের দুটি প্রেমী : পুরুষ ও স্ত্রী। জংলী ও বর্বর কল্পের বৌদ্ধ-বৌদ্ধজীবন সে রকম বাঁধন-ছাড়া ছিল না। কারণ তখন গোষ্ঠীসচেতনতা

জন্মলাভ করেছে, বা করছে। ফলে, কোন এক গোষ্ঠীভুক্ত নারী নিজগোষ্ঠী অথবা অপর গোষ্ঠীর কোন পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে তার নির্দেশ ছিল। তার দুই মূল ধারণার নাম—কনস্যান্সুইন ও পুনালুয়ান। প্রসঙ্গত বলি, দণ্ডকারণ্যে মুরিয়া আদিবাসীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জেনেছিলাম প্রতিটি মুরিয়া-রমণীর চোখে স্বজাতের পুরুষেরা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—‘আকোমামা’ (যার সঙ্গে বিবাহ হতে পারে) এবং ‘দাদাভাই’ (বিবাহ নিষিদ্ধ)। যাই হোক, অত বিস্তারিত আমাদের না জানলেও চলবে। ঐ দুটি ধারণাকে যুক্ত করে আমরা সংক্ষেপে তাকে বলতে পারি : মাতৃতান্ত্রিক সমাজ।

অর্থাৎ সন্তানের পিতৃপরিচয় ছিল না, মাতৃপরিচয় ছিল। মায়েরাই সন্তানকে স্তন্যদান করবে। লালন-পালন করবে। ‘বিবাহ’ যখন নেই তখন ‘পিতৃপরিচয়’ থাকবে কী করে ?

বস্তুত মানুষ যতদিন ছিল যাযাবর, ততদিন পিতৃপরিচয়ের প্রয়োজনও ছিল না। গোল বাধল যেদিন মানুষ কৃষিনির্ভর হতে শিখল। জনপদ গড়ে তুলল। এতদিন মায়েদের কোনও সমস্যা ছিল না—সন্তান সংখ্যার অনুপাতে প্রতিটি জননী গোষ্ঠীপতির কাছ থেকে আহাৰ্য লাভ করত। আহাৰ্য বলতে নিহত পশুর মাংস, সংগৃহীত ফলমূল বা মধু। কিন্তু দ্বিতীয় কল্পের শেষাংশে দেখা দিল এক নতুন সমস্যা। গোষ্ঠীপতি বা সর্দার জনবসতি-সংলগ্ন চাষযোগ্য ভূখণ্ডকে ভাগ করে দিলেন তাঁর অধীনস্থ পুরুষদের মধ্যে—চাষাবাদ তারাই করবে। ফলে শুরু হল ব্যক্তিগত মালিকানা-ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। রমণীকুল প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হল। সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্ব তার—সে দায়িত্ব সে অস্বীকার করতেও চায় না—কিন্তু সমাজের সম্পদ, আহাৰ্য, নিরাপত্তা সবই চলে গেছে তাদের সন্তানদের অজ্ঞাত পিতৃকুলের কজায়। ফলে, সামাজিক প্রয়োজনে প্রবর্তিত হল একটি কানুন : বিবাহ !

অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

তার অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে এল আরও একটি চিন্তাধারা : সতীত্বের সংজ্ঞা।

আসবেই। বিবাহ হচ্ছে ‘বি পূর্বক বহু ধাতু ঘণ্ট’—পুরুষদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হল বিশেষভাবে বহন করার দায়িত্ব—স্ট্রীকে, সন্তানকে। ফলে পুরুষ নিশ্চিত হতে চাইল যার ভার সে বহন করবে সেই সন্তান-সন্ততি যেন আবশ্যিকভাবে তারই হয়। পুরুষ ব্যভিচার করলে তার প্রমাণ থাকে না—ব্যভিচারের চিহ্ন দশ মাসকাল বর্ধিত চন্দ্রকলার মতো তার দেহে ঝোলোকলায় পূর্ণ হয় না। নারীর হয়। তাই সন্তানের মুখ চেয়ে—অর্থাৎ ‘হোমো-স্যাণিয়াল’ নামক প্রজাতির নিরাপত্তার প্রয়োজনে, জৈবিক নিয়মে, বিবর্তনের মৌলসূত্র মেনে, বিবর্তিত হল : সতীত্বের সংজ্ঞা।

কুমারী-বলির জন্য এতক্ষণ আমরা শুধু পুরুষদের দোষারোপ করে এসেছি, কিন্তু কুমারীত্বের ধারণাটা বস্তুত যে পূর্ববর্তী ধারণার অনিবার্য অনুসঙ্গ, ‘করোলারি’, সেই ‘বিবাহ’-নামক রীতিটির প্রচলন হয়েছে নারীজাতির স্বার্থে, তাদের সনির্বছাতিশয্যে।

আজকের 'উইমেন্স লিভ'-এর স্বাধীনতারীরা নোট করে রাখুন: এ তাঁদের স্বাধীনত-
সলিলে নিমজ্জন!

অ্যাংগেলস্ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, “সমাজ সৃষ্টির উষায়ুগে স্ত্রীলোক ছিল পুরুষের
দাসী—এই ব্রাহ্ম ধারণাটি অষ্টাদশ-শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তির কাল থেকে আমাদের মনে
বদ্ধমূল হয়েছে। বাস্তবে জংলী এবং বর্বরকল্পে স্ত্রীলোকেরা ছিল মুক্ত, স্বাধীন, এবং
সম্মানীয়।...বিবাহ-প্রথা পুরুষের আমদানি নয়। পুরুষ কোনদিনই এটা চায়নি, চাইতে
পারে না—এমন কি আজকের দিনেও নয়। যৌথ অথবা গোষ্ঠীগত বিবাহে তার
দৈহিক চাহিদা মিটত অথচ দায়িত্ব ছিল না কিছু। সমাজে ‘বিবাহ’ অর্থাৎ জোড়-বাঁধা
দ্বৈতপরিবারের পরিকল্পনাটি স্ত্রীজাতীয়দের আবিষ্কার এবং তাদের পীড়াপীড়িতেই।”¹⁷

খ. আতিথেয়তার ফলশ্রুতি : কোন কোন পণ্ডিতের মতে রতি-মন্দিরে কুমারী-
বলির প্রচলন হয়েছে আতিথেয়তার ধারণার সম্প্রসারণে। তাঁরা বলেন, বিদেশী
অতিথি—বণিক, ব্যবসায়ী, রাজপ্রতিনিধিদের আশ্রয় দেওয়া হত মন্দির-সংলগ্ন পাছশালায়।
তাদের আহার, পানীয় এবং স্বাস্থ্যের দাবী মেটানোর দায় নগরবাসীর। কিন্তু বিদেশী
পাছ কি শুধু আহার্য আশ্রয়েই ছেড়ে-আসা গৃহের সুখসুবিধা পেতে পারে? তার
প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রীর বিকল্প হিসাবে প্রয়োজন একটি সাময়িক শয্যাসঙ্গিনীর।

আমার মনে হয়েছে, এ খিরোরিটা গ্রাহ্য হতে পারে না। অতিথিসেবার আতিশয্য
যদি প্রতিটি নগরসভ্যতা মেনেও নিরে থাকে তবুও অতটা বাড়াবাড়ি অবিশ্বাস্য।
সেক্ষেত্রে নগরপ্রধান, শ্রেষ্ঠী এবং পুরোহিতেরা বিকল্প ব্যবস্থার যত্নবান হতেন। বাগানের
ফল, ক্ষেতের শস্য, গোয়ালের গরুর দুধের সঙ্গে অনুচা কন্য়ার বৌনকে সমমূল্যমানের
বলে চিহ্নিত করতেন না। অর্থমূল্যে পণ্ডিতালয় থেকে উপাদান সংগ্রহ করতেন অথবা
অন্তঃপুরে সজ্জিত উপপন্থীদের কাউকে অতিথি-সংস্কারমানসে পাঠাতেন।

গ. পুরোহিত-তত্ত্বের ব্যতিক্রম : অপর একদল পণ্ডিতের মতে ‘প্রথম রজনীর
অধিকার’ করায়ত্ত করার পর পুরোহিতরা নিজেরাই এই ব্যবস্থাটি কার্যেয় করেছিল।
নিজদের ব্রিৎসা অব্যাহত রাখতে। এই মর্মেও মনে নেওয়া চলে না। একই হেতুতে,
অর্থাৎ সেক্ষেত্রে নগর-পণ্ডিত এবং প্রধান পুরোহিত নিজ নিজ কুমারী কন্য়ার সতীকৃত
হিস করবার এই বর্বর ব্যবস্থার নিশ্চয় সাগ্ন দিতেন না।

সব কয়টি মতামত তোল করে আমাদের মনে হয়েছে—অন্যান্য হেতুতলি কোন
কোন সমাজ ব্যবস্থার ছায়াপাত ঘটালেও এই অস্বস্ত এবং প্রায় সর্বব্যাপি ব্যবস্থাপনার
মূলে রয়ে গেছে অ্যাংগেলস্-বর্ণিত হেতুটি। অর্থাৎ পূর্বকল্পের যৌথ-বৌনাচারের
ফলশ্রুতি। হয়তো তার সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে মিশেছে উর্বরতা অথবা/এবং কুমারী তত্ত্ব
অথবা/এবং বলিদান-প্রথার প্রভাব।

দেবাদাসী-প্রথা ভারতবর্ষে কখন শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও কিসের প্রেরণায় তা আমদানি করা হয়েছে তা অনুমান করা যায়:

বাইবেলে বলা হয়েছে, ঈশ্বর নিজের আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ভারতবর্ষে ঘটনাটা হচ্ছে ‘কনভার্স থিওরেম’—এখানে মানুষ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে নিজের আদলে। উপনিষদের নিরাকার পরম ব্রহ্ম যেদিন পৌরাণিকযুগে সাকার হতে শুরু করলেন—তাঁদের হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কল্পনা করা হল, তখন পুরোহিত-তন্ত্র স্বতই চিন্তা করতে শুরু করল, মানব-দেহধারী দেবদেবীদের ঐহিক-তথা-দৈহিক সুখসুবিধার যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও তাদের উপর বর্তেছে। নগরাধিপতির অনুকরণে মন্দিরাধিপতিকে দৈনিক স্নান করানো, ভোগ-রাগের আয়োজন শুরু হল। পূজা আরতি; নৈবেদ্যের পর “পানার্থে গঙ্গাদকং”এ তার পরিসমাপ্তি ঘটল না, ব্যবস্থা করতে হল, আহ্বারান্তে “তাম্বুলার্থে গঙ্গাজলং”! এমন কি মহারাজ যেহেতু আহ্বারের পর মুখপ্রক্ষালন করে থাকেন তাই দেবতার জন্য “পুনরাচমনের মন্ত্রসহ মুখপ্রক্ষালনের” আয়োজনও হল। কিন্তু আচমনের পর মহারাজ কী করেন? নিদ্রা? ঠিক তা নয়। আহ্বার ও নিদ্রার মাঝখানে থাকে আরও কিছু। অগত্যা পুরোহিতের দল খুঁজতে থাকে দেবতার উপযুক্ত এক বা একাধিক শয্যাসজ্জিনী।

হয়তো স্থূলভাবে বলেছি, কিন্তু ধারণাটা এভাবেই এসেছে। ধারণাটা নিজে থেকে আসেনি। পুরোহিত-তন্ত্রই তাকে ঐ ভাবে এনেছে। নিজ স্বার্থে যে ব্যবস্থাপনাটা সে করতে যাচ্ছে তাতে ধর্মীয় রাগুতার মোড়ক এভাবেই চড়ানো হয়েছে।

কীভাবে দেবাদাসীদের সংগ্রহ করা হত তার কোনও ঐতিহাসিক দলিল নেই। অন্তত আদি ও মধ্যযুগে। কিন্তু মন্দির পরিভাষায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের সূত্র ধরে আমরা কিছু তথ্য পাচ্ছি। মন্দির পরিভাষায় দেখছি দেবাদাসীদের ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে:

বিক্রীতা— অর্থের বিনিময়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ যখন কোন কুমারীকে ক্রয় করেন তখন সে বিক্রীতা দেবাদাসীরূপে গণ্য হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা অত্যন্ত গরীব সম্প্রদায়ের সুন্দরী বালিকা। একাধিক কন্যার পিতা সব কয়টি আত্মজাকে পাত্রস্থ করতে পারবে না আশঙ্কা করে দু-একটিকে তুলে দিত পুরোহিতদের হাতে। দেবাদাসীর গর্ভজাতা কন্যাও এই দলভুক্তা; মা যেহেতু কেনা-দাসী, তাই তার কন্যাও তাই। বালিকাবয়স থেকে তাকে নানান বিদ্যা ও কলায় পারঙ্গম করে তোলা হত—নৃত্য, গীত, অক্ষর-পরিচয়, কাব্য, পুষ্পচর্চা, আলিম্পন বিদ্যা ইত্যাদি। মন্দিরের প্রধান দেবাদাসীর তত্ত্বাবধানে তারা ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়—“পহিলে বদরিসম, পুনবরঙ্গ / দিনে দিনে অনঙ্গ আগোড়াল অঙ্গ।” রজোদর্শনের পর প্রধান পুরোহিতের নির্দেশ অনুসারে কিশোর মেয়েটির ‘অভিষেক’ হয়। অর্থাৎ কোন এক পুণ্য লগ্নে তার বিবাহ

হয়—বর কখনো দেববিগ্রহ স্বয়ং, কখনো বা তাঁর কোন প্রতীক—ত্রিশূল, চক্র বা তরবারি। সেই রাত্রেই মেয়েটির ফুলশেষ রচিত হয়। মন্দির পুরোহিত স্বয়ং অথবা তাঁর নির্দেশে কোন অধীনস্থ কর্মচারী নবাগতার কৌমার্য হরণ করে তাকে পরিপূর্ণ দেবদাসীতে রূপান্তরিত করে। সেই রাত্রি থেকে মেয়েটি হয়ে যায় আজীবনের জন্য দেবদাসী।

ভৃত্য—এরা মূলত পরিচারিকা। মন্দিরের যাবতীয় মেয়েলি কাজ—বাড়া মোছা, মন্দির-প্রক্ষালন, তৈজসপত্র পরিষ্কার রাখা, নৈবেদ্য ও ভোগ প্রস্তুত করা, চন্দন-বাটা, পুষ্পচয়ন ইত্যাদি কাজের জন্য এদের প্রয়োজন। শ্রেণীগতভাবে এরা অপর দলের চেয়ে নিচে। অবশ্য যৌবন থাকলে তাদের দেহদানকার্যও কর্তব্যভূক্ত। নৃত্যগীতের আসরে এরা উপস্থিত থাকলেও প্রায়শ অংশ গ্রহণ করত না।

ভক্তা—স্বেচ্ছায় যখন কোন রমণী—কুমারী অথবা স্বামীভক্তা, মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে দেবদাসী হতে চায় তখন সে ‘ভক্তা’। এক্ষেত্রে মূল প্রেরণা—ভক্তি। এঁরা অনেকে অতি উচ্চ শ্রেণী থেকে আসতেন—আর্থিক ও সামাজিক বিচারে। মধ্যযুগে ইউরোপের রোমান ক্যাথলিক চার্চের ‘নান’ বা সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যায়। এঁরা পর-পুরুষকে দেহদানে বাধ্য থাকতেন না! এঁদের প্রসঙ্গেই আনি বেসান্ট লিখেছিলেন, “প্রাচীন হিন্দুমন্দিরে এক শ্রেণীর পুত চিরকুমারী সেবারতা থাকতেন—তাঁদের বলা হয় দেবদাসী। তাঁরা সন্ন্যাসিনী, জিতেন্দ্রিয় এবং ঈশ্বরেই কায়মনঅন্তরাত্মা সমর্পণ করতেন।” চিতোর-মহিষী মীরাবাই ভক্তা শ্রেণীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদিও তিনি কোনও সাধারণ মন্দিরে বসবাস করেননি, তবু তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন—দেবদাসী।

দস্তা—‘ভক্তা’ শ্রেণীর সঙ্গে ‘দস্তা’র পার্থক্য দু-জাতের। প্রথম কথা, ভক্তা শ্রেণীর মৌল প্রেরণা ভক্তি; অপরপক্ষে ‘দস্তা’র প্রেরণা দু-জাতের হতে পারে। অন্ধ বিশ্বাস অথবা আত্মরক্ষা। দ্বিতীয় কথা, ভক্তা-শ্রেণীর সন্ন্যাসিনী ঐহিক অর্থে দৈহিক মিলনে বাধ্য নয়; অপরপক্ষে দস্তা শ্রেণীর দেবদাসীকে মন্দির পুরোহিত অথবা পৃষ্টপোষক অতিথিদের দৈহিক অর্থে সন্তুষ্ট করতে হত। আর একটু বিভ্রান্ত করে বলা যেতে পারে : কোনও পুণ্যলোভী গৃহস্থ মনস্কামনা চরিতার্থ করতে, ‘মানত’ রাখতে, স্বেচ্ছায় কন্যাকে মন্দিরে দান করতে পারে। এটা অন্ধ বিশ্বাস। অভিভাবক অনেক ক্ষেত্রে পিতামাতাও। গঙ্গাসাগরে সন্তান সমর্পণ কুপ্রথার সঙ্গে এখানে তুলনা করা যেতে পারে। তফাত এই—গঙ্গাসাগরে বিসর্জিত শিশুর মৃত্যুযন্ত্রণা ক্ষণিক এবং সে মৃত্যুযন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত হত না মানসিক যন্ত্রণা—সমাজ, সংসার পিতামাতার বিরুদ্ধে দুরন্ত অভিমান। কিম্বা হয়তো সহস্রাব্দির প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণায় মেয়েটিও শিকার হত। জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর মতো, এই পতিতাবৃত্তির ক্রদকে মেনে নিত নিয়তির অনিবার্য দেবদাসী ১৪

অভিশাপ বলে। এখানে জয়দেব ঘরণী পদ্মাবতীর কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। কিংবদন্তী বলে, বালিকা বয়স থেকেই পদ্মাবতী রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। কার পরামর্শে বলা হয়নি, কিন্তু এমন একটি সর্বগুণাধিতার স্থান জগন্নাথদেবের মন্দির—এ কথাই স্থির করলেন পদ্মাবতীর পিতামাতা। তখন পদ্মাবতী পঞ্চদশী। দূর গ্রাম থেকে ওঁরা পদব্রজে এলেন পুরীধামে, একমাত্র বন্যাটিকে দারুভ্রম্মের চরণে সমর্পণ করে ওঁরা বানপ্রস্থে যাবেন। কিশোরী পদ্মাবতী বোধ করি বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কী হতে চলেছে। বুঝল, যখন তাকে চন্দনচর্চিত করে, পুষ্পভারনশ্র বধূবেশে মন্দিরে নিয়ে আসা হল। প্রস্তাবটা শুনে বড় পাণ্ডার লালসাজর্জর দৃষ্টিতে সে বুঝি কিছুটা অনুমান করল। সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একপ্রান্তে।

প্রোঢ় বড় পাণ্ডা এক কথায় রাজি হয়ে গেল। তার উৎকলীয় ভাষায় আশ্বাস দেয়, কাল দিন ভাল আছে, আমি নিজেই অভিষেক করে দেব! ক্রমে পদ্মাবতী ‘গোপিকা’ হয়ে যাবে।

বড় পাণ্ডা ওঁদের যাত্রীশালায় থাকবার বন্দোবস্ত করে দিল।

কিংবদন্তী বলেনি, সে-রাত্রে মেয়েটি জনান্তিকে তার জননীকে প্রশ্ন করেছিল কি না—“মা! ‘গোপিকা’ কাকে বলে? কাল রাত্রে আমার ‘অভিষেক’ হবে মানে কী?”

কিন্তু কিংবদন্তী বলেছে, সে রাত্রে পদ্মাবতীর মাতা ও পিতা উভয়েই একটি বিচিত্র স্বপ্নাদেশ পেলেন। দু’জনেই স্বপ্নে দেখলেন, দারুভূত জগন্নাথ ওঁদের বলছেন, — এ তোরা কী করতে বসেছিস। পুরীধামে এসেছিস কেন? রাঢ়খণ্ডে বীরভূম অঞ্চলে আছে কেন্দুবিষ গ্রাম। সেখানে আমার এক উদাসীন ভক্ত আছে, নাম জয়দেব। পদ্মাবতীকে তার হস্তে সমর্পণ করে আয়! তাহলেই আমি তাকে পাব! ফলে, “জগন্নাথদেবের আদেশে পদ্মাবতীর পিতা তনয়াকে সেই উদাসীন জয়দেবের নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। কিন্তু জয়দেব তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন পদ্মাবতীর পিতা অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব তথাপি পদ্মাবতীকে যথেষ্ট চলিয়া যাইতে বলিলেন। পদ্মাবতী অতি বিনয়নশ্রবচনে কহিলেন, “জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় পিতৃদেব আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন.... আমি শুধু আপনারই চরণ সেবা করিব। অতঃপর কবি বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন।”¹⁸

কিংবদন্তী মানুন, না মানুন, পদ্মাবতী নিঃসন্দেহে দেবদাসী।

‘দাস’? তাহলে জয়দেবের পাণ্ডুলিপিতে কেমন করে লেখা হল সেই মারাম্বাক পংক্তিটা : ‘দেহিপদপল্লবমুদারং!?’

দস্তা-শ্রেণীর দেবদাসীরা যে শুধুমাত্র অন্ধ বিশ্বাসের শিকার একথা মনে করা ভুল। কারণ অভিভাবককে যে দান করতে হবে এমন কথা নেই। অনেক প্রাপ্তবয়স্কা রমণী—কুমারী অথবা স্বামীত্যাগিনী—স্বয়ং মন্দিরে এসে ‘দেবদাসী’ হবার জন্য আবেদন করেছে

এমন নজিরও আছে। আত্মদানীও ‘দস্তা’-শ্রেণীভুক্ত। এ-ক্ষেত্রে দেখা গেছে মাতৃপিতৃহীন কিশোরী বা তরুণী আত্মীয়-স্বজনের লালসার হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রেরণায় মন্দিরের শরণ নিয়েছে। নিঃসন্দেহে দস্তা-দেবদাসীর জীবন পতিতালয়ের রূপোপজীবিনীদের অপেক্ষা অনেক-অনেক বেশী কাম্য। আত্মীয়-স্বজন—যে রক্ষক সেই ভক্ষক—তাদের রিরংসা ঐ মেয়েটিকে অন্যথায় অনিবার্যভাবে সেই লালবাতিজ্বলা চাকলাটায় টেনে আনত।

হুতা—এদের সম্বন্ধে মন্দির-সাহিত্য স্বতই স্বল্পভাষ—হেতুটা সহজবোধ্য। নামকরণ থেকেই বোঝা যায় আইনের ফাঁকে এদের অপহরণ করে আনা হত। নিরুদ্দিষ্টা মেয়েটির সন্ধান পেত না সে অঞ্চলের নগর কোটাল। বহু দূর দেশে মন্দিরের অন্ধকূপে বন্দিরূপে সে জীবন অতিবাহিত করত।

অলঙ্কারা—নামেই তাদের পরিচয়। এক মন্দিরে একজন। মন্দিরের মুকুটমণি। নৃত্যগীতাদি চৌধুটি-কলায় এরা পারদর্শিনী—অপূর্ব রূপবতী। অন্যান্য শ্রেণীর নামকরণের মধ্যে তাদের সংগ্রহকার্যের ইঙ্গিত আছে, অলঙ্কারা-শ্রেণীর দেবদাসীর তা নেই। বস্তুত যে-কোনও শ্রেণীর দেবদাসীই এই শীর্ষ পদে উন্নীত হতে পারে—রূপ ও গুণের মাপকাঠিতে। মন্দিরের দেবদাসীদের সে হচ্ছে রানী। সকলে তার আদেশ মেনে চলতে বাধ্য। শিবমন্দিরে তার নাম ‘রুদ্রগণিকা’, সম্বোধনে রুদ্রাণি; বৈষ্ণব মন্দিরে তার নাম ‘গোপিকা’। দেবদাসীর আমলাতন্ত্রের সোপানে যদিচ ‘অলঙ্কারা’র স্থান সবার উপরে তবু এক-হিসাবে তার মর্যাদা ভক্তাশ্রেণীর নিচে। ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই—তুলনা করে বলা যায়, যেমন সসাগরধরণীর অধিপতির আসন কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর নিচে। হেতু একটাই—অলঙ্কারা শ্রেণীর দেবদাসীকে কচিং কখনও অতি উচ্চশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষককে দেহদানে তুষ্ট করতে হত। তাই ‘অলঙ্কারা’র তুলনা ‘ভক্তা’র সঙ্গে চলবে না, চলতে পারে সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার ‘রাজনটি’ অথবা ‘জনপদকল্যাণী’র সঙ্গে। ‘রাজনটি’ রাজানুগৃহীতা নৃত্যগীত-পটয়সী রূপোপজীবিনী; অপরপক্ষে ‘জনপদকল্যাণী’ প্রাইভেট-প্র্যাক্টিশনার। নিজ-মঞ্জিলে ইচ্ছামতো সে পুরুষ খরিদারকে আমন্ত্রণ করে নৃত্য-গীত বা আর কিছু দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে পারে। শ্রেষ্ঠী-বণিক-পাশু আর হাঁ, স্বয়ং রাজাও। রাজনটির উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য শ্যামার নায়িকা, অপরপক্ষে ‘জনপদকল্যাণী’র উদাহরণ বৈশালীর ‘আম্রপালী’ অথবা কপিলবস্তুতে বুদ্ধদেবের অনুজ নন্দের প্রণয়িনী, যার প্রাচীর চিত্র অক্ষয় হয়ে আছে অজস্রের বোড়শ-গুহায়।

..... বোধকরি যুক্তিতর্কের এই কণ্টকবৃন্ত পাঠকের ভাল লাগিতেছে না ‘আমি কী করিব? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকাল সঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—হে প্রাণ! হে প্রাণাধিক!—সে সব কিছুই নাই—ধিক।’

তথাস্তু! দেবদাসীসৌখের বনিয়াদের ‘বঙ্কিম’-খিলান পরিত্যাগ করিয়া আসুন গল্পের সুপারস্টারকারের কারুকৃতি লক্ষ্য করা যাউক.....

দেবদাসী ১৬



খ্রীষ্টপূর্বাব্দ দুইশত সাঁইত্রিশ। মহানগরী
বিদিশার অনতিদূরে একটি নগণ্য গণ্ডগ্রাম।
আর্যাবর্তের মানচিত্রে নামটি অচিহ্নিত :
কাকনায়।^১ জনবসতি নিতান্ত অল্প, কিছুদূরে
গোলপাতায়-ছাওয়া পর্ণকুটির; তার গর্ভে
আশ্রয় নিয়েছে কিছু মেহনতি মানুষ। আর
বিদিশা নগরী থেকে আগত কিছু ভাস্কর,
যারা ইতিপূর্বে ছেনি-হাতুড়ি চালনায় ছিল
অনভ্যস্ত। তারা হস্তিদন্ত-শিল্পী। বিজন
প্রান্তরে সদ্য গড়ে-ওঠা গণ্ডগ্রামের মধ্যভাগে
একটি অনুচ্চ টিলা; তার উপর দুটি ক্ষুদ্রকায়
স্তূপ। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটি বিহার, একটি

চৈত্য এবং কিছুদূরে যেন সামান্য স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে একটি ভিক্ষুণী বিহার।

নির্মীয়মাণ সজ্জারামের প্রধান অর্হৎ মহা-থের বুদ্ধভদ্রের দৃঢ়বিশ্বাস—কালে এই
অখ্যাত জনপদটি হয়ে উঠবে মহাতীর্থ। বীজটি উণ্ড হয়েছে, মহীরূপে রূপান্তরিত
হতে কয়েক দশক বা কয়েক শতাব্দী লাগবে—এই যা।

স্তূপ দুটির একটির গর্ভে সুসংরক্ষিত মহা-অর্হৎ সারিপুত্ত এবং মহামৌদগল্যায়নের
পূতাস্থি। অপরটিতে সঙ্গোপনে সংরক্ষিত হয়েছে এমন এক সম্পদ যা অচিস্তানীয়।
প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে মগধরাজ অজাতশত্রু সেই মহাসম্পদটি সংগ্রহ করে
এনেছিলেন কুশীনগরের অধিপতি মল্লরাজের নিকট থেকে, তাঁর বিচক্ষণ ব্রাহ্মণমন্ত্রী
দ্রোণের সহায়তায়। মাত্র দুই দশক পূর্বে দেবনাম পিয়তস্স সম্রাট প্রিয়দর্শী সেই পরম
সম্পদটি স্বহস্তে সংরক্ষিত করে গেছেন স্তূপগর্ভে।^২

মূল স্তূপটিকে ঘিরে গড়ে উঠছে খড-সূচী-বেদিকা-প্রদক্ষিণপথ। পূর্ব-তোরণটি
সুসমাপ্ত, তার বরাঙ্গে জাতকের নানান কাহিনী! বর্তমানে নির্মিত হচ্ছে দক্ষিণ-তোরণ।
মহা-থের-এর অনুমতিক্রমে বিদিশার শিল্পীদলকে স্বীকৃতি দিতে তার একপ্রান্তে সম্প্রতি
খোদিত হয়েছে একটি লিপি—“বিদিশাকেহি দত্ত্বাকরেহি রূপকম্মাম কৃতম^৩।”

আমাদের কাহিনী কালে, সেই দুইশত সাঁইত্রিশ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গণ্ডগ্রাম কাকনায়
নেমে এসেছে এক মর্মবিদারক দুঃখের ঘনাকার। সংবাদবহ পাটলিপুত্র থেকে
প্রত্যাবর্তন করেছে সেই নিদারুণ বার্তাটি নিয়ে: সন্ধর্মের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক দেবনাম

পিয়তস্‌স মগধরাজ প্রিয়দর্শী আর ধরাধামে নাই।

ক্ষুদ্রায়তন চৈত্রে সমবেত হয়েছেন সকলে। চৈত্র্যটি আয়তাকার—দূরতম প্রান্তে একটি জুপ; দুই পার্শ্বে দুই সারি স্তম্ভ। ঘৃতপ্রদীপের আলোকবর্তিকায় সন্ধ্যার ঘনাকার সন্বেও চৈত্র্যভাস্তর আলোকিত। এক দিকে বসেছেন ভিক্ষু, অপরদিকে ভিক্ষুণীর দল। সঙ্ঘারামের অগ্গবিনতা মহাভিক্ষুণী পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে জুপকে বরণ করলেন। মহা-থের উচ্চারণ করলেন প্রার্থনামন্ত্র। সন্ধ্যাট প্রিয়দর্শীর আত্মার শান্তি-কামনা করে সন্ধ্যাপ্রার্থনাসভার অবসান ঘটল।

মহাভিক্ষুণী সেবানন্দাকে পুরোভাগে নিয়ে ভিক্ষুণীর দল—সংখ্যায় তাঁরা মাত্র সাতজন—প্রত্যাবর্তন করলেন ভিক্ষুণী-বিহারে। অন্যান্য সকলে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বিদায় হলেন। মহাভিক্ষুণী তাঁর একান্ত-সহচরী মালতিকে ডেকে বললেন, আমার অজিনাসনটি বিছিয়ে দাও। আজ আমার উপবাস। আমি ধ্যানে বসব।

আদেশমাত্র মালতি ওঁর ধ্যানের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিল। মহাভিক্ষুণী সেবানন্দা পঞ্চাশোক্ষা; তাঁর মুণ্ডিত মস্তক, পরনে পীতবাস, সর্বাস্থে নেই কোনও আভরণ। কিন্তু এখনও তার দেহে জরা রেখাপাত করতে পারেনি। এখনও তিনি তপ্তকাক্ষনবর্ণা। নিঃসন্দেহে যৌবনকালে তিনি অসামান্য সুন্দরী ছিলেন।

সন্ধ্যাট প্রিয়দর্শীর মহাপ্রয়াণে তিনি আজ কিছু বিচলিত। মালতী কক্ষ ত্যাগ করার পর তিনি অজিনাসনে উপবেশন করলেন না। পরিবেশের অপর প্রান্তে রক্ষিত একটি পেটিকার বন্ধন উন্মোচন করতে থাকেন। পেটিকাটি নানান তাল ও ভূজপত্রের পুঁথিতে আকীর্ণ। তার ভিতর হস্তসঞ্চালন করে নিম্নতম স্থান থেকে তিনি উদ্ধার করে আনলেন একটি অতিক্ষুদ্র রত্নমঞ্জুষা। তার গর্ভস্থ বস্তুটি আজ তিন-দশক আলোক স্পর্শ লাভ করেনি। বহুক্ষণ সেটিকে দুই হস্তে ধারণ করে মহাভিক্ষুণী রুদ্ধদ্বার পরিবেশস্থ নিবাস্ত্র নিষ্কম্প দীপশিখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। মহাভিক্ষুণী আর দীপশিখা পরস্পরের উপমান তথা উপমেয় হয়ে গেল। তারপর অক্ষুটে মস্তোচ্চারণের মতো বললেন, তুমি তো অশোক! তাহলে আমাকে কেন দিয়ে গেলে এত বড় শোক?

নাঃ। সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না। রত্নমঞ্জুষার অভ্যন্তরে দুঃপাতের লোভ সংবরণ করে পুনরায় সেটিকে স্বস্থানে সংস্থাপিত করলেন। অজিনাসনে ধ্যানে বসার উপক্রম করলেন এমন সময় দ্বারে মুদু করাঘাত হল।

পুনরায় গত্রোত্থান করলেন মহাভিক্ষুণী। দ্বারের অর্গল মোচন করে বললেন, কী মালতি?

মালতি সলজ্জে ক্ষমা ভিক্ষা করে বলে আজ পূর্বাহ্ন থেকে এক অন্ধ বৃদ্ধ আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। দুঃসংবাদ শ্রবণে আমরা কেউই সেকথা মনে রাখিনি। তিনি এখনও পরিবেশ-সম্মুখস্থ বৃক্ষতলে অপেক্ষা করছেন।

মহাভিক্ষুণী বিস্মিতা হলেন, অন্ধ বৃদ্ধ! আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী! কেন?

—সে-কথা তিনি শুধু আপনাকেই নিবেদন করতে চান?

—উত্তম। কিন্তু যথাবিহিত অতিথি-সৎকার করা হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আপনি অনুমতি করলে....

—ঠিক আছে। তাঁকে এখানে নিয়ে এস।

পরিবেশ অপ্রস্তুত। তদ্বিন্দ্র সেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। মহাভিক্ষুণী স্বয়ং এসে বসলেন পরিবেশ-সম্মুখস্থ প্রাপ্তগের এক শিলাসনে। একটু পরেই বৃদ্ধের হস্তধারণপূর্বক মালতি প্রত্যাবর্তন করল। আগন্তকের বয়স যদি ষাট হয়, তবে বলতে হবে তিনি অকালে জরাগ্রস্ত। উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত। পরিধানে ধূলিমলিন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড। নগ্নবক্ষের প্রতিটি পঙ্খর গণনা করা যায়। মালতি অন্ধকে সম্বোধন করে বলল, আপনি মহাভিক্ষুণী অগ্গবিনতার সম্মুখে এসেছেন। কী বলতে চান, বলুন?

বৃদ্ধ সাষ্টাঙ্গে মহাভিক্ষুণীকে প্রণাম করলেন। বললেন, অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি, মা। কিন্তু আমি নিরুপায়। একটি ভিক্ষা আছে.....

—বলুন?

—আমি অন্ধ, অশক্ত। কিন্তু আমার পুত্রটি দক্ষ কারিগর। তাকে যদি অনুগ্রহ করে কাকনায় মহাবিহারের নির্মাণ কার্যে....

—সে-কথা বলতেই কি এই মধ্যরাত্রে....

বৃদ্ধ সসঙ্কোচে বলেন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, মা!

মহাভিক্ষুণী তৎক্ষণাৎ আত্মসংশোধন করে বলেন, না, আমারই ভুল। শুনেছি আপনি দিবাভাগেই এসেছিলেন। আমরা একটি দুঃসংবাদ শ্রবণে—

—জানি মা, জানি। অমন ইন্দ্রের মতো মহারাজ....

—ইন্দ্রের মতো! আপনি তাঁকে স্বচক্ষে কখনো দেখেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখেছি বইকি। তখন আমার দৃষ্টি ছিল তো। সে আজ চার দশক পূর্বেকার কথা। তাঁকে দেখেছি। শালপ্রাংশু, মহাভুজ। তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম যোগীমহেশ্বর মন্দিরে।

মহাভিক্ষুণী একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, কী? কী? কী? মন্দির? যোগীমহেশ্বর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মধ্য আর্যাবর্তে। রামগড় পর্বতে। সেখানে নির্মিত হয়েছিল পাশপাশি দুটি গুহামন্দির—যোগীমহেশ্বর এবং সীতা-বঙ্কিমা। যোগীমহেশ্বরে পূর্বযুগে থাকতেন আদিকবি বান্মীকি। আর সীতা-বঙ্কিমায় থাকতেন নির্বাসিতা সীতামঙ্গি। নিত দিয়ে বহে চলেছে রেন্দ্র নদী। আমি সেই গুহামন্দিরের ভাস্কর ছিলাম, মা। অনেক-অনেক মূর্তি খোদাই করেছি সেখানে। গন্ধর্ব-কিন্নর, নৃত্যরতা দেবদাসী। তখন তো আমার দৃষ্টি ছিল...আর জনলেন মা, মন্দিরের প্রবেশ-তোরণে আমি একটি মূর্তি খোদাই

করেছিলাম; সূতনুকার....

সজ্জন উচ্চারণ নয়, অনিবার্য প্রতিধ্বনির মতো মহাভিক্ষুণী বললেন, সূতনুকার!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ছিল সেই মন্দিরের প্রধানা দেবদাসী, রুদ্রাণী! অমন অসামান্য সুন্দরীর —বাক্যটি শেষ হল না বৃদ্ধের। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে সব অবাস্তর কথা শুনিয়ে কী লাভ? সূতনুকার সে রূপও নেই, রূপ দেখবার দৃষ্টিও নেই রূপদক্ষ দেবদম্মির....

বৃদ্ধ নীরব হল। বোধকরি সে কোন বিস্মৃত অতীতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর যেন সস্থিত ফিরে পেয়ে বলে, আপনারা কি এখনও আছেন? মায়েরা?

মালতি সাড়া দেয় না। প্রস্তর-বেদিকায় মাথা রেখে সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আর দীপশিখাটি হাতে নিয়ে যেন স্থপ প্রদক্ষিণ করছেন অগ্গবিনতা। এদিক-ওদিক নানাদিক থেকে ঐ অন্ধ বৃদ্ধের ভিতর তিনি কী যেন খুঁজছেন।

—মা?

সস্থিত ফিরে পান এতক্ষণে! ছি ছি ছি! এ কী করছিলেন এতক্ষণ! কিসের এ কৌতূহল? আত্মবিশ্বাস ফিরে পান তিনি। বলেন, কিছুই নেই বলছেন কেন রূপদক্ষ? যোগীমহেশ্বর গুহায় আপনার সেই মূর্তিটা তো শাস্ত হয়ে রইল—

—না মা, নেই। অপরাধীদের সন্ধান না পেয়ে সহস্রাক্ষের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল ঐ মূর্তিটার উপর। সেটাকে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

এবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল অগ্গবিনতার। বলেন, মূর্তিটাও তাহলে রইল না?

—শুধু কি তাই মা? তার পরিবর্তে শাস্ত হয়ে রইল একটা প্রহসন। কে যেন সেই বিদীর্ণ মূর্তির পাদমূলে কৌতুক করে উৎকীর্ণ করেছে একটি পংক্তি—“দেবদম্ম সূতনুকারে ভালবেসেছিল।”

অগ্গবিনতা ইন্দ্রিয় সংযমে অভ্যস্ত। কূর্ম যেমন তার হস্তপদাদি নিজ দেহবর্মের ভিতর লুক্কায়িত করে, ঠিক তেমনি নিজ বিচ্ছিন্ন চিন্তা, উচ্ছ্বাস হৃদয়াবেগকে সঙ্কুচিত করে প্রশ্ন করলেন, আপনি দৃষ্টি খুইয়েছেন কবে? কী করে?

—সে সব কথা শুনে আপনার কী লাভ, মা? দুঃখীর জীবন বড় দুঃখের।

—তবু বলুন আপনি।

—সহস্রাক্ষ অপরাধীকে খুঁজে পায়নি, কারণ আমি মধ্য আর্য্যাবর্তের অরণ্য-পর্বতে দীর্ঘ তিনমাস আত্মগোপন করে ছিলাম। শুধু ফলমূল আর ঝরনার জলই ছিল আমার জীবনধারণের উপাদান। ঐ সময় কোনও বিষাক্ত ফলের রসে আমার দুটি চক্ষুই নষ্ট হয়ে যায়।

—তারপর?

দেবদাসী ২০

—তারপর আর কী বলব, মা? সহস্রাক্ষের মৃত্যুর পর যোগীমহেশ্বরে গিয়েছিলাম; কিন্তু সূতনুকার সাক্ষাত পাইনি। সে নাকি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর আমিও পথে পথে ফিরতে থাকি। এক জন্মদুগ্ধিনী আমাকে গ্রহণ করে। সে ছিল খঞ্জ, অন্ধ নয়। আমরা দুজনে দুজনকে ভর করে এতদিন বেঁচে ছিলাম। সে স্বর্গে গেছে; কিন্তু তার সন্তানটি আমারই মতো... না। আত্মপ্রশংসা করব না মা, আর আপনি তো আমার হাতের কাজ দেখেননি। আপনি বরং নিজে পরখ করে তাকে কাজে বহাল করবেন।

অগ্নগবিনতা এতক্ষণে সম্পূর্ণ আত্মস্থ হয়েছেন। না, ঐ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের প্রতি কোন আকর্ষণ, কোনও অভিমান, কোনও মোহ আজ তাঁর নাই। আজ এই মুহূর্তে যেন তাঁর উপসম্পদগ্রহণ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। একদিন—সেই যেদিন ছেনি হাতুড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রূপের কাজল দেবদ্বন্দ্ব প্রথম সূতনুকার তনুদেহটি আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেছিল, চুশনে চুশনে তাঁকে উন্মাদ করে দিয়েছিল, সেদিন যেমন সূতনুকার ইচ্ছা করেছিল রামগড় পাহাড়ের শিখরে শিখরে, ঘোষণা করে বেড়াতে : ‘আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি অমৃতের আনন্দ’—ঠিক তেমনি আজ অগ্নগবিনতার ইচ্ছা করছিল, কাকনায়ের চৈত্য-বিহারের পথে পথে চিৎকার করে বলতে: “ওগো তোমরা শোন, আমি পেয়েছি মহাকাব্যিকের কৃপা। আর কাউকে ডরাই না আমি। কিছুকেই ভয় করি না। বর্তমানকে জয় করেছিলাম, ভবিষ্যৎকে জয় করেছিলাম, আজ আমার অতীত জয় সুসম্পন্ন!”

সূতনুকা দেবদ্বন্দ্বের বন্ধনমুক্ত হয়ে চিৎকার করেনি, বসে পড়েছিল রতিক্রান্তার মতো। অগ্নগবিনতাও চিৎকার করে উঠলেন না, বসে পড়লেন বৃদ্ধের পাশে ধুলায়। ককুণায় আগ্রত হয়ে গেল তাঁর মাতৃহৃদয়। বললেন, ভয় নেই, রূপদক্ষ দেবদ্বন্দ্ব। আপনার পূত্রকে কাল নিয়ে আসবেন। তাকে এই সজ্জারাম নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করব আমি। বাকি জীবনে আপনার আর অর্থাতাব থাকবে না।

পরম আশ্বাসে চরম কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধ পুনরায় সান্ত্বাসে প্রশাম করল অগ্নগবিনতাকে।

মালতি বৃদ্ধের হাত ধরে প্রস্থান করা মাত্র অগ্নগবিনতা পরিবেশের অর্গল রুদ্ধ করলেন। এবার তিনিও সান্ত্বাসে প্রাণিপাত করলেন পরিবেশ-প্রান্তস্থিত বুদ্ধপ্রতীক ক্ষুদ্র ছুপকে। অক্ষুট মন্তোচারণ করলেন :

উপনীতবয়সো চ দানি সিম্
সম্পন্নাতোসি যমসস্ সন্তিকে।
বাসোপি চ তে নখি অন্তরা
পাথেয়ামপি চ তে ন বিজ্জতি।।^৪

বারম্বার আত্মসম্বোধন করে স্বীকার করলেন, “এতদিনে তোমার যৌবনজ্বালা প্রশমিত হয়েছে। তুমি বৃদ্ধা হয়েছে, মৃত্যুর অতি সন্নিকটে উপনীত...এমতাবস্থায় তুমি

নিজের জন্য একটি নিভৃত পুণ্যদ্বীপ গঠন কর, নির্মল ও কামজয়ীর স্বাক্ষর রাখ।”

কামজয়ীর স্বাক্ষর! ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনা উত্তরণের জয়সম্ভ্র। হ্যাঁ, এতদিনে সে মহান ব্রত-উদ্যাপনের মহালগ্ন সন্নিকট। যে অন্তরীণ ‘নাম’টি মনের অবচেতনে উঁকি দিলে ঐ যৌবনোত্তীর্ণা ভিক্ষুণী আজও রোমাঞ্চিততনু হতেন সেই নাম রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর চর্মচক্ষুর সম্মুখে উপনীত হল—তবু তাঁর কোনও চিন্তাবিকার ঘটল না। রূপদক্ষ দেবদিল্লির প্রেতাঙ্কাকে দেখে তাঁর মাতৃহৃদয়ে করুণার উৎসমুখটি উন্মোচিত হল শুধু।

—নমো বুদ্ধায় গুরবে, ধম্মায় তারিণে, সঙ্ঘায় মহোত্তমায় নমঃ।

পুনরায় পোটিকাটি বন্ধনযুক্ত করলেন। ঘৃতপ্রদীপটি উজ্জ্বলতর করে নির্ভয়ে এবার উন্মোচন করলেন ক্ষদ্রায়তন রত্নমঞ্জুষার আচ্ছাদন। দীর্ঘ তিন-দশকের বন্দিদশা উত্তরণে রাজাসুরীয় লক্ষ প্রতিবিম্বে হেসে উঠল খিলখিলিয়ে। এক প্রদীপের আলোকবর্তৃকা লক্ষরূপ পরিগ্রহ করে পরিবেশের পাষণচত্বরে জ্বলে দিল দীপাধিতায় তারার মালিকা। অগ্ন্যবিনতা অট্টহাস্য করে ওঠেন এতক্ষণে। আত্মজয়ের সাফল্যে। অঙ্গুরীয়কে সম্বোধন করে বলেন, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আত্মজয় সম্পূর্ণ না করে তোমাকে বিদায় দেব না। আজ এই মুহূর্তে আমি আত্মজয়ী। কালই তোমাকে বিদায় করে দেব। সজ্জের রত্নভাগুরই তোমার একমাত্র স্থান।

প্রদীপ শিখাটি নির্বাপিত করে প্রস্তরশয্যায় শয়ন করলেন অতঃপর। মুক্তির আশ্বাদ পেয়েছেন এতদিনে। অন্তরীণ অতীত স্মৃতির বিরুদ্ধে আত্মবিন সংগ্রাম করতে করতে এই তিন-দশক নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। অতৃপ্ত কামনা-বাসনা-জড়ানো সেই বৃত্তকু সূতনুকাকে কিছুতেই নিশ্চিহ্ন করতে পারেননি। আজ তিনি নির্ভয়। অনায়াসে মুক্ত করে দিলেন স্মৃতির রুদ্ধকপাট। ভেসে চললেন স্মৃতির চিন্তাস্রোতের উজানে—

সংবাদবহকর্তৃক অনীত একটি সুসংবাদে রামগড় পর্বতে আজ কর্মচাঞ্চল্য। সর্বত্রই একটা আনন্দোচ্ছ্বাস। সমাগরা ধরণীর অধীশ্বর পরমভট্টারক মগধাধিপতি সম্রাট অশোক স্বয়ং আসছেন যোগীমহেশ্বর মন্দিরে পূজা দিতে। সম্রাট সদ্য সিংহাসন লাভ করেছেন; চলেছেন উজ্জয়িনী থেকে পাটলিপুত্র—সেস্থল থেকে যাবেন চেদীরাজ্যে, কলিঙ্গ বিজয়ে। পথে রামগড় পর্বত। সংবাদবহ তাই বার্তা এনেছে—সম্রাট যোগীমহেশ্বর মন্দিরে পূজা সমাপনান্তে যুদ্ধযাত্রা করতে চান।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল। যোগীমহেশ্বর এবং সীতাবন্ধিমা মন্দিরে।

শুধু একজন এ আনন্দ সংবাদে বিচলিত। তাঁর রক্তচন্দন ত্রিগুণ্ডকের দুই পার্শ্বে ভ্রুযুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। তিনি যোগীমহেশ্বর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সহস্রাক্ষ। তাঁর একান্ত সহচর বলভদ্র প্রশ্ন করে, গুরুদেব, এ সংবাদে আপনাকে এত বিচলিত দেবদাসী ২২

মনে হচ্ছে কেন?

সহস্রাঙ্ক একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, বলভদ্র! আমার আশঙ্কা পরমভট্টারক পূজাদানমানসে আদৌ আসছেন না এখানে। চণ্ডাশোকের শ্যেন দৃষ্টি দেবদ্বিজে নাই, সে শুধু উদ্‌গ্রীব পরস্বাপহরণে!

গোপন কথাবার্তা হচ্ছিল মন্দিরের প্রাধান্য দেবদাসী সূতনুকার একান্ত কক্ষে। সূতনুকা প্রশ্ন করে, কিন্তু তাতেই বা আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন গুরুদেব? আপনার তো সিংহাসনচ্যুত হবার আশঙ্কা নাই! আপনার এমন কী সম্পদ আছে যা তিনি হরণ করবেন?

সহস্রাঙ্ক শ্মিত হেসে বলেন, তুমি জান না, সূতনুকে। আমার মন্দির-ভাণ্ডারে এমন এক রত্ন আছে, যা মগধাধিপতির রাজকোষেও নাই।

সূতনুকা স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রশ্ন করতেও সাহস হয় না তার।

—সে সম্পদ তুমি! তোমার রূপ ও গুণের সুখ্যাতি উজ্জয়িনী পর্যন্ত পৌঁছেছে। মহানগরী উজ্জয়িনীর মহাকাল-মন্দিরে তোমাকে অপসারিত করার একটা ষড়যন্ত্র অনেক দিনই চলেছে। এত রূপ নাকি এ বিজ্ঞ বনের পক্ষে বাড়াবাড়ি। একটা সংগ্রামের জন্য আমি ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতও হচ্ছিলাম। কিন্তু মহাকাল-মন্দিরের প্রধান পুরোহিত একটা হিমালয়াস্তিক মুখামি করে বসল। সম্রাট উজ্জয়িনীতে উপনীত হলে সে তাঁকে ই নিবেদন করল এই বার্তা! ভাবল, চণ্ডাশোক এই বিজ্ঞ বন থেকে উদ্ধার করে তোমাকে উজ্জয়িনীর মন্দিরে দেবদাসী করবে। মুখটা চণ্ডাশোককে চেনে না। চণ্ডাশোক শ্রবণমাত্র স্থির করেছে—সতাই যদি তুমি সমগ্র আর্ধ্যবর্তের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হও, তবে তোমার উপযুক্ত স্থান রাজধানী পাটলিপুত্র। সেই মহানগরীর রাজনটী হবে তুমি।

বজ্রাহত হয়ে গেল মেয়েটি। আকৈশোর মুগ্ধদর্শকের দৃষ্টির দর্পণে সে পাঠ করেছে ঐ বার্তাটি: সূতনুকা অসামান্য সুন্দরী! কিন্তু তাই বলে পাটলিপুত্রের রাজনটীর পদ! সে যে উর্বশী-ঈজিত!

স্মরণে আছে সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যার কথাও।

দুটি মন্দিরের মধ্যবর্তীস্থলে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। পশ্চাত্ত্যাগে ধাপে ধাপে পর্বতসোপানে দর্শকাসন। সম্মুখে একটি সুবর্ণদণ্ড-শোভিত চন্দ্রাতপের কেন্দ্রবিন্দুতে সম্রাটের সিংহাসন। গুটি-তিনচার বয়স্য সমভিব্যাহারে তিনি আসীন; অর্ধচন্দ্রাকারে সজ্জিত দর্শকাসনের সম্মুখে নৃত্যগীতের আসর। একক নৃত্যে সেখানে স্বর্গ রচনা করছে যোগীমহেশ্বর মন্দিরের রুদ্রগণিকা : সূতনুকা।

দর্শকদল স্তব্ধ, নির্বাক। নৃত্যান্তে পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানাল নর্তকী; প্রথমে দেবমন্দিরের দিকে ফিরে, পরে সমাগরাধরণীর অধীশ্বরকে।

সম্রাট আহ্বান করলেন, অগ্রসর হয়ে এস, রুদ্রাণি।

সভয়ে কৃতাজ্জলিপুটে সম্রাটের সম্মুখে নতজানু হল দেবদাসী।

সম্রাট তার চিবুকটি উঁচু করে ধরলেন। দীপলোকে দীর্ঘ সময় একদৃষ্টে কী যেন লক্ষণ মিলিয়ে দেখলেন। চুপ্চাপে তরুণীর মতো নতনেত্রে প্রতীক্ষা করে রইল মেয়েটি।

সম্রাট বলেন, তুমি সার্থকনামা। মর্ত্যের উর্বশী।

সুতনুকার গণ্ডনায় বালার্ক-অরুণাভা। সম্রাট বিদূষকের দিকে ফিরে বললেন, বল বটু, এই অনিন্দিতাকে কী পুরস্কার দেওয়া রাজধর্মসম্মত?

বিদূষক তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, শিরশ্ছেদের আদেশ, মহারাজ! পাটলিপুত্রের রাজনটী এর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সাহসই পাবে না। ওকে বরং স্বর্গে পাঠিয়ে দিন—উর্বশী-মেনকা-রজ্জার নাসিকা ছেদন করে তাই দিয়ে একটা রত্নহার বানিয়ে ও গলায় পরুক!

সুতনুকা হেসে ফেলেছিল; কিন্তু সহস্রাক্ষের অক্ষিতারকা জ্বলে উঠেছিল অলাতবস্ত্রের মতো। তাহলে তাঁর আশঙ্কা অমূলক নয়। বিদূষকের তির্যক ইঙ্গিতই তার প্রমাণ।

সম্রাট নিঃশব্দে নিজ অঙ্গুলি থেকে একটি হীরকাসুরীয় উন্মোচন করে পরিণে দিলেন সপ্তদশীর চম্পকাস্নানিতে। আংটিটা মাংসে বড় হল। তা হোক, অসুরীয় সমেত তার কক্ষ করাটি মুষ্টিবদ্ধ করে নিজ বজ্রমুষ্টিতে গ্রহণ করে সম্রাট বললেন, এই সামান্য অসুরীয় তোমার পুরস্কার নয় সুতনুকে—এ শুধু আমার দখলী-স্বস্ত্রের ইঙ্গিতবাহী। আমি চলেছি কলিঙ্গ বিজয়ে। যদি জীবিত প্রত্যাবর্তন করতে পারি, তবে তুমিই হবে আমার বিজয়ীর পুরস্কার! পরিবর্তে তুমি হবে আর্ষ্যবর্তের শ্রেষ্ঠ রাজনটী।

সুতনুকা বজ্রহতা। সহস্রাক্ষ আগ্নেয়গর্ভ!

সম্রাট জনতার দিকে ফিরলেন। সেখানে সারি সারি উপবিষ্ট রূপদক্ষের দল, যারা অকৃত্রিম পর্বতগুহাকে ছেনি-হাতুড়ির শাসনে রূপান্তরিত করেছে কৃত্রিম গুহামন্দিরে। সম্রাট বললেন, আমার অভিলাষ—সুতনুকা এই মন্দির ত্যাগ করে পাটলিপুত্র যাত্রা করার পূর্বে তার একটি মর্মর আলেখ্য ঐ মন্দির তোরণের সম্মুখে খোদিত হক। কে সেই দায়িত্ব নিতে সম্মত?

সমবেত রূপদক্ষের দল অধোবদন হল।

সম্রাট বললেন, কে তোমাদের দলপতি? রামগিরি পর্বতের শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষ—একটি পলিতকেশ বৃদ্ধ কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হল।

সম্রাট বললেন, রূপদক্ষ! তোমার এবং তোমাদের কারুশিল্পে আমি মুগ্ধ। এখন আমি সম্রাট হিসেবে প্রশ্ন করছি না, শিল্প-শিক্ষার্থীর মতো জানতে চাইছি—বল, ঈশ্বরসৃষ্ট এই নারীমূর্তির ছব্ব অনুকরণ কি সম্ভব?

বৃদ্ধ রূপদক্ষ সলজ্জে ঋণাত্মক শিরশ্চালন করল। জনতার একাংশে শ্রুত হল মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে চঞ্চল মধুমক্ষিকার গুঞ্জনধ্বনি। তৎক্ষণাৎ নিজে সঙ্কোচন দেবদাসী ২৪

করে বুদ্ধ বলল, সশ্রী! আমি বুদ্ধ, নব্যযুগের রূপদক্ষরা এ বিষয়ে কী মত পোষণ করেন তা আমি জানি না।

—বটে! তা নব্যযুগের রূপদক্ষদের কী বক্তব্য? আমি যেন কী একটা গুঞ্জন শুনলাম মনে হচ্ছে।

এইবার আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হল একজন তরুণ ভাস্কর। সশ্রী ভক্তিত্ব হয়ে গেলেন তাকে দর্শন করে। অসামান্য রূপবান সেই তরুণ। বিংশতি-বর্ষ বয়ঃক্রম হতে পারে। শ্যামাঙ্গ। পেশীবহুল সুগঠিত জন্ম, উন্নতনাঙ্গ, আয়ত চক্ষুতে যেন অপার্থিব স্বপ্নলোকের আভাস। যেন কন্দর্প বিশ্বকর্মার ভূমিকায় মর্ত্যে নেমে এসেছেন অভিনয় করতে!

—তোমার নাম? পরিচয়?

—আমার নাম দেবদ্বিজ, আমি এক দীন লুপদক্ষ।

—বল, রূপদক্ষ! কী বলতে চাও আমার প্রশ্নের উত্তরে? এই নারীর হবহ অনুকরণ কি সম্ভব?

দেবদ্বিজের কণ্ঠস্থরে এবার দীনতা নেই, বরং কিছুটা দার্ঢ্যের ব্যঞ্জন। বললে, সশ্রী! আপনি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বররূপে এ প্রশ্ন করেননি; নিছক স্বীকৃতিমতে এই মুহূর্তে আপনি শিল্প-শিক্ষার্থী। তাই আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরের পূর্বে আমি একটি প্রতিপ্রশ্ন পেশ করতে ইচ্ছুক: হবহ অনুকরণ সম্ভব কি অসম্ভব এ-প্রশ্নের পূর্বে বলুন, সেটা কি বাঞ্ছনীয়?

সশ্রীরে লুপদক্ষের জাগল। এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, কেন নয়? সূতনুকার প্রশ্নানের পরে তার একটি নিখুঁত প্রতিমূর্তির এখানে স্থায়ী আসন পাওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?

—“নিখুঁত” এবং “হবহ” কি সমার্থক, মহারাজ?

সদ্ধর্ম গ্রহণের পূর্বে অশোক ছিলেন চণ্ডাশোক, কিন্তু শিল্পের প্রতি অনুরাগ তাঁর আবাল্য। কৌতূহলী হয়ে বলেন কী বলতে চাইছ তুমি?

—আমি যদি এ রমণীর প্রতিমূর্তি গড়ি, তবে আমি তা ‘নিখুঁত’ করতে চাইব, ‘হবহ’ অনুকরণ নয়!

সশ্রীরে গুষ্ঠাধারে ফুটে উঠল মৃদু হাস্যরেখা। বললেন, তুমি কি মনে কর—ঐ আদর্শ রমণীমূর্তি ক্রটিহীন নয়?

যুক্তকরে রূপদক্ষ নির্ভয়ে নিবেদন করে তার বক্তব্য: আক্ষেপে হ্যাঁ সশ্রী! তাই মনে করি আমি।

সূতনুকা এতক্ষণ একদৃষ্টে দেখছিল ঐ কন্দর্পবিনির্মিত তরুণটিকে। তার এ কথায় সচকিত হল সে। তার নাসিকায় জাগল কুঞ্জনরেখা।

তৎক্ষণাৎ সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেবদ্বন্দ্ব বললে, এইবার ঐ অনিন্দিতার দিকে দৃকপাত করুন, সশ্রী। আমার প্রতিমূর্তির নাসিকা কোনদিন কুণ্ঠিত হবে না। তার অনুদেহে শুধু অলঙ্কার থাকবে, অহঙ্কার থাকবে না। তার দীপ্তি থাকবে, দাহ থাকবে না! তার বিকাশ থাকবে, প্রকাশ থাকবে না।

সশ্রী সহস্রাক্ষের দিকে ফিরে বললেন, এই রূপদক্ষকে এক বৎসরের জন্য নিয়োগ করুন। ব্যয়ভার রাজকোষের। প্রতিদিন সুতনুকা এক দণ্ডের জন্য এর সম্মুখে উপস্থিত হবে। বৎসরান্তে আমি এখানে প্রত্যাবর্তন করব। ও যদি নিজ প্রতিজ্ঞামতো মূর্তি নির্মাণে সক্ষম হয়, তাহলে ও হবে সশ্রী অশোকের রূপদক্ষদলের প্রধান; যদি ব্যর্থ হয় তবে যোগীমহেশ্বরকে নরবলি দিয়ে যাব আমি।

এরপরের একটি বৎসরের কথা মহাভিক্ষুণীর স্মৃতিপট থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সহস্রাক্ষ যেমনভাবে ঋণিত্রের আঘাতে আঘাতে বিচূর্ণ করেছিল দেবদ্বন্দ্বের গড়া নারীমূর্তিটি, ঠিক সেইভাবে নির্মম আঘাতের পর আঘাতে গত তিন দশক ধরে মহাভিক্ষুণী তাঁর স্মৃতির পাষণফলক থেকে নির্মূল করেছিলেন পরবর্ত্তী এক বৎসরের স্মৃতি। মনে পড়ে না, কিছই মনে পড়ে না— একটি বৎসরের অপার্থিব আনন্দের সমুদ্রোচ্ছ্বাস সম্পূর্ণ শুষ্ক। ‘নিব্বাণ’ প্রাপ্ত।

তবু সঙ্গীত সমাপ্ত হয়ে যাবার পরও যেমন তার একটি রেশ থেকে যায়, ধূপ নিঃশেষিত হয়ে যাবার পরও যেভাবে বাতাসে ভাসতে থাকে তার সৌগন্ধ, তেমনি বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে একটি অনির্বচনীয় আনন্দের হিল্লোল আজও এই পঞ্চাশোক্ষী মহাভিক্ষুণীর অন্তরে আতাসে ইঙ্গিতে ধরা দেয়।

এটুকু মনে আছে, প্রতিদিন প্রত্যুষে স্নানান্তে এসে দণ্ডায়মান হতে হত ঐ রূপদক্ষের সম্মুখে। আর মনে আছে—কী যেন একটা কানামুখা শুরু হয়েছিল। সুতনুকার নাকি বারে বারে তাল কাটতো নৃত্যভঙ্গিমায়! নিত্যপূজায় দেখা যেত নানা জাতের স্রাস্তি। সশ্রী চণ্ডাশোক আর কোনদিন ফিরে আসেননি কলিঙ্গ যুদ্ধ থেকে। চণ্ডাশোক নিহত হয়েছিল চেদী রাজ্যে; সেখানে জন্ম নিয়েছিলেন ধর্মাশোক। যোগীমহেশ্বর মন্দিরের রুদ্রগণিকা তখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে গেছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে।

তারপর? তারপর কী হল মনে নেই। শুধু এটুকু স্মরণ হয়—সহস্রাক্ষ জানতে পেরেছিল—চণ্ডাশোক নয়, ঐ রূপদক্ষ দেবদ্বন্দ্বই ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায় সুতনুকাকে। বঞ্চিত করতে চায় যোগীমহেশ্বরকে তাঁর প্রধানা রুদ্রগণিকার সেবা থেকে। গুপ্তঘাতক নিয়োগ করল পুরোহিত। গোপন সংবাদটা সুতনুকাই দিয়েছিল দেবদ্বন্দ্বকে। অসীম ক্ষমতাশালী সহস্রাক্ষের সমস্ত ষড়যন্ত্রজাল বিদীর্ণ করে দেবদ্বন্দ্ব আত্মগোপন করল। আর কোনদিন সে ফিরে আসেনি।

অগণবিনতা জানেন না, দেবদ্বন্দ্বের গড়া সেই নারীমূর্তিটি সুতনুকার সৌন্দর্যকে দেবদাসী ২৬

অতিক্রম করেছিল কি না, কিন্তু এটুকু জানেন—ঐ এক বৎসরে, না—ছেনি-হাতুড়ি নয়, অন্য কী-এক অতনু-মস্ত্রে সে সুতনুকানামী একটি নারীর অনুতে তুলে দিয়েছিল অলঙ্কার, কেড়ে নিয়েছিল অহঙ্কার ; সুতনুকার অন্তরে অবশিষ্ট ছিল শুধু প্রেমের দীপ্তি, দাহ নয়! তার সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেনি, ঘটেছিল বিকাশ।

সুতনুকা বুঝতে শিখল—রুদ্রগণিকার ভূমিকা একটা প্রহসনমাত্র! একটা বিরাট ষড়যন্ত্রজালের সে শিকার, পিঞ্জরাবদ্ধ হতভাগিনী। সুতনুকা গোপনে একদিন মন্দির ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সেদিন তার লক্ষ ছিল রূপদক্ষ দেবদিন। নিরুদ্ধিষ্টকে সে খুঁজে বার করবেই। পারেনি।

তারপর একদিন তার ব্যর্থ মানবপ্রেম সার্থক বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত হল। দেহজ কামনা বাসনা নয়, মহাকাঙ্গিকের কৃপাই হল একমাত্র কাম্য।

সুতনুকার মৃত্যু হল। আজ সন্ধ্যায় ঐ অন্ধ বৃদ্ধের সম্মুখে তার আত্মাও ‘নিরূপণ’ লাভ করল—অন্ত্যোষ্টিক্রিয়াও সুসম্পন্ন!

পরিনির্বাণের একান্ত ইচ্ছা নিয়ে অবশিষ্ট রইল—দেবদাসী নয়, বৃদ্ধাদাসী সেবানন্দা।

পরদিন প্রত্যুষে যখন শয্যা ত্যাগ করলেন, তখনও তাঁর স্বপ্নের ঘোর কাটেনি। পূর্ব আকাশে বালার্ক অরুণাভা—শুকতারা তার আলোকবর্তিকাটি এখনও ঐ দিবাকরের আলোকবন্যায় নিমজ্জিত করে দেয়নি। কিন্তু সে-মুহূর্ত আসন্ন। অগগবিনতা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে সর্বপ্রথমেই পুনরায় উন্মোচন করলেন সেই রত্নমঞ্জুষাটি। হীরকাসুরীয়টি নিষ্কাশ করে সেটি বেঁধে নিলেন পীতবসনের অঞ্চলপ্রান্তে। দিনের প্রথম কর্তব্য—সেটি সজ্জের রত্নাগারে দান করে আসা।

মহাস্থবির বুদ্ধভদ্রকে অসঙ্কোচে পূর্ব জীবনের সমস্ত গ্রানির কথা খুলে বলেছিলেন একদিন—সে আজ তিন দশক পূর্বেকার কথা। সকল বার্তা শ্রবণান্তে মহাঅইং উপসম্পদা দান করেছিলেন তাঁকে। কিন্তু স্বীকৃত হননি ঐ হীরকাসুরীয়টি গ্রহণ করতে। বলেছিলেন ভিক্ষুণি! (তখনও তিনি অগগবিনতার পদে উন্নীতা হননি) এটি তোমার কাছেই রাখ। এটিকে দান করবার অধিকার আজও তুমি অর্জন করনি। যেদিন অন্তরে অনুভব করবে অতীত নিঃশেষে মুছে গেছে—সুতনুকার তিলমাত্র অবশেষ নেই তোমার অন্তরে, সেদিন এসে এটি আমাকে হস্তান্তরিত কর।

আজ সেই মহালগ্ন সমুপস্থিত।

পরিবেশের অর্গল উন্মোচনমাত্র দেখা হয়ে গেল মালতির সঙ্গে।

পদবন্দনা করে মালতি বললে, মা, গতকল্য যে অন্ধ বৃদ্ধটি এসেছিলেন, তাঁর পুত্র এই অতি প্রত্যুষেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে কি অর্ধদণ্ডকাল পরে আসতে বলব?

অগগবিনতা সহাস্যে বললেন, না। আজকের শুভদিনটির সূচনা হক তাকে আশীর্বাদ করে। সে আমার সন্তানতুল্য। তাকে আহ্বান করে নিয়ে এস।

পরিবেশের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের পাষাণচত্বরে এসে উপবেশন করলেন অগগবিনতা। অল্প পরে মালতির অনুগামী হয়ে এসে আবির্ভূত হল একটি বিংশতিবর্ষীয় তরুণ।

চিত্রাৰ্পিতার ন্যায় আসন ত্যাগ করে দণ্ডায়মান হলেন মহাভিক্ষুণী! তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে গেল!

শ্যামাঙ্গ। পেশীবহুল সুগঠিত তনু, উন্নতনাসা, আয়ত চক্ষুতে যেন অপার্থিব স্বপ্নলোকের আভাস। যেন কন্দৰ্পমর্ত্যে নেমে এসেছেন বিশ্বকর্মার ভূমিকায় পুনরভিনয় করতে!

কৃতজ্ঞ তরুণটি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে উদ্যত হল মহাভিক্ষুণীকে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মতো দূরে সরে গেলেন অগগবিনতা! শুধু বললেন, ননা!

—না? তরুণ রূপদক্ষ ভূষিত। প্রশ্ন করে, আপনি, ...আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন না?

—না! প্রণাম গ্রহণের অধিকার অত সহজে জন্মায় না!

...ও অগগবিনতা! কী বলিলে? প্রণাম গ্রহণের অধিকার তোমার নাই? তাহা হইলে গভকল্য বয়ঃজ্যোষ্ট বৃদ্ধের প্রণাম গ্রহণ করিয়াছিলে কেন্ আক্কেলে?...

ক্ষুদ্ধ ভাস্কর গত্রোখান করে। মহাভিক্ষুণীর সম্মুখে কৃতাজ্ঞলিপুটে দণ্ডায়মান হয়। সেবানুশার মুণ্ডিত মস্তক ওর ব্যাৎসের সমতলে। তরুণ ভাস্কর বলে, প্রণাম গ্রহণ করুন আর না করুন, আপনি পিতৃদেবকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

—ননা! —রুদ্ধকণ্ঠ থেকে একটিমাত্র নঞর্থক শব্দ নির্গত হল।

—কী না? বিস্মিত তরুণ রূপদক্ষ কৌতূহলী।

অগগবিনতাকে বড় বিহ্বল মনে হল। সন্তরণ-অনতিজ্ঞা যেন সমুদ্রস্রোতের সময় পায়ের নিচে বালুকার স্পর্শ পাচ্ছেন না। প্রথম সাক্ষাৎ-মুহূর্তে যে ভয়ঙ্করী সমুদ্রতরঙ্গ তাঁর মাথার উপর উঠে পড়েছিল, পরমুহূর্তেই সাধন-অভ্যাসের কাছে সেই তরঙ্গ-ভঙ্গ সরে গেছে—তবু চরণপ্রান্তে যেন প্রত্যাশিত বালুকাতুমির নিশ্চিন্ত নিরাপত্তাটা খুঁজে পাচ্ছেন না। মালতির দিকে ফিরে বললেন, অতিথিসেবার আয়োজন কর, মালতি।

মালতিও প্রশিধান করেছে—বুদ্ধি দিয়ে নয়, বোধ দিয়ে—কোথাও কিছু একটা ঘটেছে, ঘটছে, ঘটতে চলেছে। ঘটনা-পরম্পরা তার বুদ্ধিসীমার অতীত, কিন্তু স্থানত্যাগের এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু প্রশিধান করতে তার কালবিলম্ব ঘটল না।

তরুণ পুনরায় প্রশ্ন করে, আপনি কী যেন একটা কথা তখন বলতে চাইছিলেন? দেবদাসী ২৮

অসীম আয়াসে আত্মসংবরণ করে প্রৌঢ়া বললেন, হ্যাঁ, শোন, সাঁচী-কাকন্যায় তোমাকে কোনও নির্মাণকার্যের দায়িত্ব দিতে আমি অক্ষম।

বজ্রাহত হয়ে গেল প্রত্যাশী ভাস্কর!

অগ্গবিনতার অধর বেপমান। অস্ফুটে শুধু বললেন, বাধা আছে।

অধোবদন হল অতিথি। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। কেন এভাবে প্রতারণিত হল, কোন অলক্ষ্য নির্দেশে মহাভিক্ষুণী সেবানন্দা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন, তা জানতে চাইল না। প্রস্থানোদ্যত হতেই পিছন থেকে ভিক্ষুণী বললেন, শোন! তাই বলে তোমার হতাশ হবার কিছু নেই। তুমি মহাতীর্থ উরুবিম্বে গমন কর—

—উরুবিম্ব? সে কোথায়?

—তার বর্তমান নাম: বুদ্ধগয়া। সেখানেও একটি প্রকাণ্ড চৈত্যমন্দির, সঙ্ঘারাম নির্মিত হচ্ছে। তোমার দৃষ্টিহীন পিতৃদেবকেও নিয়ে যাও। সেখানে যাতে তুমি কর্মলাভে সফল হও তা আমি দেখব—সেখানকার মহা-থেরকে আমি সুপারিশপত্র লিখে দেব।

বহুক্ষণ ইতস্তত করল তরুণ। কেন কাকন্যায় তার কর্মসংস্থান হতে পারে না—এ প্রশ্ন জানতে চাইল না। জানতে চাইল না কী তার অপরাধ। পরিবর্তে অস্ফুটে শুধু বলে, বুদ্ধগয়া যে অনেক দূরের পথ, মা। আমার পাথেয় কোথায়?

অগ্গবিনতা নিঃশব্দে তাঁর চীবরপ্রান্তে গ্রহিণীমোচনাঙ্কে উদ্ধার করে আনলেন একটি অঙ্গুরীয়। ঐ সূচ্যম তরুণের দক্ষিণ হস্তটি গ্রহণ করে তার অনামিকায় পরিয়ে দিলেন, সেই রাজাঙ্গুরীয়টি। এবার মাপে সেটা ঠিক হল। বিস্মিত তরুণ বলে, এ কী! এ যে হীরকাঙ্গুরীয়। এ যে মহার্ঘ।

—হ্যাঁ! তাই! মূল্য যাচাই করে সাবধানে এটিকে বিক্রয় কর। আর শোন, এই হীরকাঙ্গুরীয় যে তুমি আমার নিকট লাভ করেছ—এ কথা দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ কর না—না, তোমার পিতৃদেবকেও নয়।

এবার আর কৌতূহল দমন করা সম্ভবপর হল না। বললে, কেন?

অগ্গবিনতা নীরব। তাঁর দুই চক্ষু বাষ্পাকুল।

ইতস্তত করে তরুণ বলে, এটা কি...এটা কি তাহলে অপহৃত সম্পদ?

—না, না, না, —আমি....আমিই ঐ হীরকাঙ্গুরীয়ের আইনসম্পত্ত অধিকারিণী।

—তাহলে....?

একটু ইতস্তত করলেন মহাভিক্ষুণী। না, নীরব থাকার অধিকার তাঁর নাই! অভিধম্ম-মতে এ স্থলে নীরবতার অর্থ তাঁর অন্তর নিম্নলুপ্ত। সেটা অসত্য! পাতিমোক্ষ-মতে যেন তিনি অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি নিতে উদ্যত; তাই অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, কাকন্যায়-সঙ্ঘারামের অগ্গবিনতার এটি একটি ...কী বলব? প্রাক্সন্ন্যাসজীবনের বেদনাবহ দুঃস্বপ্ন।

শুকতারা এতক্ষণে সূর্যালোকে নিশ্চিহ্ন।

বার্লক অরুণরাগে তরুণ ভাস্করের মুখমণ্ডল ভাস্বর। এবং পঞ্চাশোৰ্ষ ভিন্ধুগীর
কক্ষ কপোল।

যেন উদয়ভানুর প্রথম কৌতুহল ঐ অসমবয়সের দুটি নরনারীর মুখে একটা কিছু
খুঁজছে। বৃথাই! বোধকরি প্রভাতসূর্য সন্ধান করছিল সেই চিরন্তন প্রশ্নটার প্রত্যুত্তর
—যোগীমারা পর্বতের কন্দরে দীর্ঘ বিশ শতাব্দী পূর্বে কোন্ অজ্ঞাত কবি যে প্রশ্নটা
মহাকালের দরবারে একদিন পেশ করেছিলেন, যা আজও অমীমাংসিত প্রশ্নচিহ্নটিকে
আঁকড়ে ধরে প্রতীক্ষা করছে :

“—ও কেমন করে নিঃশেষে নিমজ্জিত হল

এমন গভীর—সুগভীর প্রেমে?”

pathagat.net



প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্যে কয়েকটি শব্দ পাই: বেশ্যা, গণিকা, পুংশ্চলী প্রভৃতি। কিন্তু তাদের প্রকৃতি বা জীবনযাত্রার কোন নির্দেশ নেই। পৌরাণিক যুগের সাহিত্যে তাদের চেহারাটা একটু স্পষ্ট; পুরাণগুলি অধিকাংশই খ্রীস্টজন্মের প্রায় সমসময়ে বা পরবর্তীকালে রচিত। কিন্তু প্রাক-বুদ্ধযুগের কাহিনী পুরাণকারেরা কতটা নিষ্ঠাভরে রচনা করতে পেরেছিলেন সেটাই বিবেচ্য।

বৌদ্ধযুগে রূপোপজীবিনীদের উল্লেখ আছে, বুদ্ধের জীবনকালে এবং প্রাক-বুদ্ধযুগের জাতক-কাহিনীতে, যদিও সেগুলি পরবর্তীকালে রচিত।

জাতক-যুগের কয়েকজন রূপোপজীবিনীকে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে চিনি, রবীন্দ্রনাথের কৃপায়—বাসবদন্তা, শ্যামা, প্রভৃতি। এরা দেবদাসী নয়; তার সহোদরা বলা চলে—এরা রাজনটী অথবা বৌদ্ধ জাতকের ভাষায়—জনপদকল্যাণী। কৌতূহলী পাঠককে এই প্রসঙ্গে জানাই যে, রবীন্দ্রনাথ কাহিনীগুলি জাতক থেকে সংগ্রহ করলেও স্বকীয় কল্পনায় তাদের সম্পূর্ণ নূতন করে সৃষ্ট করেছেন।

যেমন ধরুন শ্যামার^১ কাহিনীটি। জাতক অনুসারে বজ্রসেন আদৌ অন্যায় অপবাদে ধরা পড়েনি; সে সত্যই ছিল চোর। উত্তীয়ও স্বেচ্ছায় আত্মবলি দেয়নি—শ্যামা তাকে কৌশল করে নগর-কোটালের কাছে পাঠিয়েছিল বলি দিতে। আর সবচেয়ে করুণ অবস্থা জাতকানুসারে চৌড়চুড়ামণি বজ্রসেন শ্যামার অলঙ্কার অপহরণ করে পালিয়েছিল। শ্যামা তার সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ফিরেছিল বটে, কিন্তু তার প্রেরণার উৎসমূলে ছিল অপহৃত অলঙ্কারের পুনরুদ্ধার। বজ্রসেন—এর সাক্ষাৎ সে পায়, কিন্তু বজ্রসেনকে পায় না। বিফল মনোরথ শ্যামা তার অভ্যস্ত জীবনে ফিরে আসে। এই স্থূল উপাদানটুকু অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ যে কাহিনী গড়ে তুলেছেন তার আবেদন সহজ্রগুণে মর্মস্পর্শী।

কিন্মা ধরুন, দিব্যদানের বাসবদন্তার^২ কাহিনী। মথুরাপুরীর ভৌগোলিক অবস্থান

ঠিক আছে ; কিন্তু উপগুপ্ত সর্বভাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না। যদিও তিনি অন্তরে ছিলেন তথাগতর একান্ত ভক্ত, কিন্তু পেশাগতভাবে ছিলেন একজন ‘ফার্মাসিউটিস্ট’। মথুরায় জনপদকল্যাণী বাসবদত্তা তার দাসীকে পাঠিয়েছিল মুদি দোকানে থেকে কিছু ‘কালাগুরু’ কিনে আনতে। ঝি বাজার করে আনলে আজকের দিনের গৃহস্বামিনী যা করে থাকেন, বাসবদত্তাও তাই করতে বসল, অর্থাৎ হিসাব নিতে। তার মনে হল ওজনে কম আছ। উপগুপ্ত ঠিকমতোই ওজন করে দিয়েছিলেন, বাস্তবে দাসীটি বাজার থেকে ফেরার পথে ঐ দুর্মূল্য বস্তুটির কিয়দংশ হস্তাঘবতায় স্থানান্তরিত করেছিল মাত্র। কিন্তু মেয়েটি ছিল বুদ্ধিমতী। কষ্টের তিরস্কার শুরু হতেই সে গালে হাত দিয়ে সে-কালীন প্রাকৃতে বলেছিল, “ওমা আমি কনে যাব গো। হ্যাঁ দিদিমণি। অমন কতটি বোলনি বাপু! অমন কন্দপ্যাকান্তি দোকানদার তোমারে ঠকাবে। তারে দেখলি তোমার নিজেরই পেতায় হত নি! সে যেন ‘নিম্ময়ুর’ কান্তিক।”

দাসীর উদ্দেশ্য সফল হল। রূপবর্ণনায় কৌতূহলী বাসবদত্তা স্বয়ং এল তদন্তে। এবং মজল। এখানে পৌঁছেও কবি কিন্তু জাতককারের বর্ণনার অনুসারী হতে পারেননি। জাতকবর্ণিত বৃষস্কন্ধ কামোদীপক যুবাশ্রয় তাঁর দৃষ্টিতে হয়ে গেল—“শুভ্রলাটে ইন্দুসমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।”

পরের পংক্তিটিকে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নির্ভাভরে অনুসরণ করেছেন জাতককারকে। ঐ পংক্তিটি জাতকের একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ, “এখনো আমার সময় হয়নি....সময় যখন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।”

কবির মতে সেই সময় এসেছিল বসন্তকালে, বাসবদত্তার সঙ্গ যখন বিষাক্ত; কিন্তু জাতককারের বর্ণনায় উপগুপ্ত নটীর কাছে এসেছিলেন বধ্যভূমিতে—মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত নটীর শেষমুহুর্তে।

এত কথা কেন বলছি?

সুতনুকা-দেবদত্তের প্রেমকাহিনী কপোল-কল্পনায় সজিয়ে নেবার কৈফিয়ত হিসাবে।

স্বাধিকারপ্রমত্ত হওয়ার এ প্রেরণা স্বয়ং গুরুদেবের!

জাতক—তা সে যখনই রচিত হোক প্রাক-বুদ্ধযুগের কাহিনী। বুদ্ধদেবের সমকালে পাচ্ছি আর একজন রাজনটিকে। আশ্রপালীকে। বৈশালী নগরীর জনপদকল্যাণীকে। আশ্রপালীর জন্ম নিয়ে নানান কিংবদন্তী। বিনয় পিটক অনুসারে আশ্রপালী স্বয়ম্ভু। বৈশালী নগরী তখন লিচ্ছবীদের রাজধানী। লিচ্ছবীরাজ মহানামের একটি সুবৃহৎ আশ্রকননে আশ্রপালী পূর্ণযৌবনারূপে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষাচার্যের নির্দেশে মহারাজ মহানাম সেই অয়োনিসম্ভবার সন্ধানে নির্গত হন এবং আশ্রকননে তার সন্ধান পান। সকলকলাপারঙ্গমা এই সুতনুকাকে দেখে সকলেই মোহিত। কৌণ্ড, শাক্য, মগধী ও লিচ্ছবীবংশীয় সকল রাজা এবং রাজপুত্রেরা এই অবিশ্বাস্য আবিষ্কারে

মুখ—সকলেই তাকে বিবাহ করতে উৎসুক। মহানাম প্রমাদ গণলেন! অযুত পাণিপার্থীর ভিতর মাত্র একজনকেই সন্তুষ্ট করা সম্ভব—বাকি সকলেই হয়ে যাবে তাঁর শত্রু। অগত্যা মহারাজ ‘গণ’-এর শরণ নিলেন। গণ হচ্ছে ‘সিটি কাউন্সেল’ - নগর প্রধানদের পঞ্চায়েত। গণ বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে এলেন এই ‘অনির্ভব’ সুতনুকা ব্যক্তিবিশেষের অঙ্কশায়িনী হতে পারে না—সে হবে বৈশালীর জনপদকল্যাণী : সর্বজনভোগ্যা প্রধানা নটী!

গণ-এর সিদ্ধান্ত অতঃপর জ্ঞাপন করা হল আম্রপালীকে। সে সহাস্যে বলল, আপনাদের এই বিচার আমি শিরোধার্য করতে স্বীকৃত; কিন্তু বিনিময়ে আপনাদের তিনটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। শর্তসাপেক্ষে আমি স্বাভাবিক পুরস্কার জীবন বিসর্জন দিতে স্বীকৃত।

—কী শর্তত্রয়?

—প্রথম শর্ত: নগরীর কেন্দ্রস্থলে নির্মিত হবে আমার প্রাসাদ, রাজপ্রাসাদের সমতুল্য!

গণ এ শর্ত এককথায় মেনে নিলেন। জনপদকল্যাণী মহারাজার সমমর্যাদাসম্পন্ন, ‘ফার্স্টলেডি’! দ্বিতীয় শর্তটিও ওঁরা মেনে নিলেন; প্রতিটি অতিথি আমাকে প্রতি রাত্রের জন্য পাঁচশত কার্ষাপণ সম্মানমূল্য দিতে বাধ্য থাকবে; এবং একজন অতিথি বিদায় নিলে দ্বিতীয় জনকে আমার প্রাসাদে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে।

কিন্তু তৃতীয় শর্তটি কী?

—প্রাসাদে আমার স্বনিযুক্ত প্রহরী ও সহচরী থাকবে। প্রাসাদ অভ্যন্তরে আমার আইনই প্রযোজ্য—গণ-এর কোনও এজিয়ার থাকবে না।

—তা কেমন করে সম্ভব? তোমার প্রাসাদে যদি কোনও অতিথি নিহত হয়, আমরা তদন্ত করে দেখতে পারব না?

—পারবেন। কিন্তু আমাকে পূর্বেই জানাবেন। আমার সম্মতিসাপেক্ষে তদন্ত হবে। অভিযোগ দাখিলের পর অন্তত সপ্ত দিবস অতিক্রান্ত হলে।

কঠিন শর্ত! কিন্তু গণ এটি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কারণ আম্রপালী জানিয়েছিলেন সে যেমন স্বয়ম্ভু, তেমনি স্বৈচ্ছামতুর অধিকারিণী। দেব-অংশে তার আবির্ভাব—শাপভ্রষ্টা সে, গণ এ শর্ত মেনে না নিলে সে আত্মবিলুপ্তিতে বাধ্য হবে। গণ-এর ইচ্ছা ছিল না এ শর্ত স্বীকার করতে, কিন্তু কামনাভাজের লিচ্ছবী নাগরিকদের পীড়াপীড়িতে এ শর্তটিও স্বীকৃত হল।

আম্রপালী হল বৈশালীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—বস্তুত সমগ্র আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন! প্রতি রজনীতে পাঁচশত কার্ষাপণ দক্ষিণা নিয়ে অচিরে সেই ধনি হয়ে উঠল বৈশালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠা ধনী।

আমাদের কাহিনীর কালে—আর শুধু আমাদের ‘কাহিনীর কাল’ কেন, সর্বকালেই আর্যাবর্তের মানবশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শাক্যসিংহ—তিনি তখন পরিব্রাজক। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সম্রাট হচ্ছেন মগধাধিপতি বিম্বিসার। গঙ্গার দক্ষিণে পাটলিপুত্র, উত্তরে বৈশালী। ভৌগোলিক দূরত্ব অকিঞ্চিৎকর—তিন প্রহরের অঞ্চালনা এবং এক প্রহরে গঙ্গা-পারাপার। তবু অসীম শক্তিদ্বারা মগধাধিপতির কাছে ঐটুকু দূরত্বই দূরত্বক্রম্য। হেতু: লিচ্ছবিদের সঙ্গে মগধের তখন প্রচণ্ড বিরোধ। বৈশালী নগরীতে মগধ রাজকে শনাক্ত করতে পারলে লিচ্ছবী ধনুর্ধরেরা ভীষ্মপর্বের শেষ দৃশ্যটির পুনরাভিনয় করে ছাড়বে! কিন্তু শুধু সে জন্য সসাগরাধরণীর অধিশ্বর ক্ষান্ত হবেন? বিশেষ সার্থবাহ পুণ্ডরীক সেদিন যে কথা তাঁকে বলল তা শুনেও।

পুণ্ডরীক স্বনামধন্য মাগধী বণিক। কার্যোপলক্ষে সে প্রায়ই যায় বৈশালীতে। একাধিক রজনী সে যাপন করেছে আশ্রপালীর প্রাসাদে। পুণ্ডরীক মহারাজের বয়স্যস্থানীয়। তাই সেবার ফিরে এসে সে অকুণ্ঠভাবে বলেছিল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে মগধ-সম্রাট করেননি, করেছেন সামান্য মাগধী বণিক!

সম্রাট সেকৌতুকে বলেছিলেন, এ কথা হঠাৎ মনে হল কেন পুণ্ডরীক?

—নিজ অভিজ্ঞতা নেই মহারাজ, শুনেছি সিংহাসনের গদি খুব আরামদায়ক। কিন্তু আশ্রপালীর উপাধানের চেয়ে নয় বোধ করি!

—আশ্রপালীর শয্যার উপাধান এতই কামদার?

—আজ্ঞে না! তার পীবর-বন্ধের যুগল উপাধানের কথা বলছি, মহারাজ!

বিম্বিসার বলেন, কেন? পাটলিপুত্রের জনপদকল্যাণী জাম্ববতীর কী দোষ হল?

পুণ্ডরীক সহাস্যে বলে, সেটাও আমাকে জেনে যেতে হবে। আশ্রপালী জনতে চেয়েছে।

—কী?

—সে প্রশ্ন করেছিল, পাটলিপুত্রে রসালবৃক্ষ আছে কি না। জনতে চেয়েছিল, মহারাজের প্রাসাদকাননে কি শুধুই জামের গাছ? এ কথা বলেই কৌতুকময়ী একটি পাকা জাম ছুঁড়ে মেরেছিল আপনার গায়ে।

—আমার গায়ে?

—না। মানে আপনার আলেখ্যের গায়ে। তার প্রমোদকক্ষে সমগ্র আর্যাবর্তের নৃপতিবর্গের প্রাচীরচিত্র। আপনার আলেখ্যটি তার শয্যার পদপ্রান্তে।

—পদপ্রান্তে? আমাকে অপমান করতে?

—মহারাজ, আপনি মহাভারত পড়েননি? নিদ্রাভঙ্গে সে যে বিশেষ একজনের চিত্রই দেখতে চায়।

এরপর বিশ্বিসারের পক্ষে আত্মসম্বরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এক অভিসার রজনীতে গাপনে তিনি ছদ্মবেশে নির্গত হলেন। কিন্তু খেয়াঘাটের সীমান্তপ্রহরী তাঁকে শনাক্ত করে ফেলল। বিশ্বিসার যে তাঁর অশ্বটিকে ছদ্মবেশ পরাননি। আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ নৃপতির গহনটি ছিল অশ্বকূলে উচ্চৈঃশ্রবা। সম্রাট অশ্বারোহণে যতক্ষণে উপস্থিত হলেন আশ্রপালীর প্রমোদকুঞ্জে ততক্ষণে সমগ্র বৈশালী চঞ্চল। অচিরে সেই গণিকালয়াটি অবরুদ্ধ করল লিচ্ছবী সেনানায়কেরা। আশ্রপালী মহান অতিথির পরিচর্যার কী আয়োজন করবে স্থির করে ওঠার পূর্বেই সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ পাষাণকুটিমে ধ্বনিত হল: দ্বার উন্মুক্ত কর, আশ্রপালিকে! তোমার প্রাসাদে তব্বার প্রবেশ করেছে!

প্রাসাদকুঞ্জের ইন্দ্রকোষের অন্তরাল থেকে আশ্রপালী প্রশ্ন করে, কে তোমরা? কী চাও?

—আমরা লিচ্ছবী গণ-এর সেনাবাহিনী। সংবাদ পেয়েছি, বৈশালীর চিরশত্রু তোমার প্রাসাদ-অভ্যন্তরে আত্মগোপন করেছে। পলাতককে সমর্পণ কর।

আশ্রপালী অকুতোভয়ে বলে, গণ-এর বিচারে আশ্রপালী সর্বজনভোগ্য! সে অজাতশত্রু!

জনারণ্যের ভিতর কে যেন ব্যঙ্গ করে, অজাতশত্রু নয়। তার বাপকে চাই।

আশ্রপালী বলে, গণ-অধিপতিকে বল, তাঁর অভিযোগ গ্রহণ করলাম। শর্তানুসারে সপ্তদিবস অন্তে প্রাসাদ তল্লাসী করতে পার তোমরা।

সপ্তদিবস-রজনী লিচ্ছবী ধনুর্ধরেরা অতল প্রহরায় বেষ্টন করে রইল গণিকার কেলিকুঞ্জ। কিন্তু ভস্ম হবার আশঙ্কায় কি মদন বিরত হয়েছিল পঞ্চশর বর্ষণে? আসন্ন সর্বনাশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দুটি নরনারী সপ্তদিবস-রজনী বিভোর হয়ে রইল। তারপর কোন অলৌকিক মন্ত্রবলে সেই বেষ্টনী ভেদ করে মগধাধিপতি স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেছিলেন সে কথার উল্লেখ করতে ভুলেছেন বিনয় পিটিককার। কিন্তু ভোলেননি জানাতে যে, তিনি বৈশালীতে সেই আনন্দঘন সপ্তাহের একটি স্থায়ী চিহ্ন রেখে এসেছিলেন।

যথাকালে ভূমিষ্ট হল সেই সন্তান—পুত্রসন্তান—অভয় বা জীবক। বৈশালী তাকে সুনজরে দেখেনি। না দেখাই স্বাভাবিক—শিশুহত্যাও করেনি কিন্তু। অবজ্ঞায়, অনাদরে, শুধুমাত্র জননীর একান্ত সাহচর্যে শিশু হয়ে ওঠে বালক। পাঠশালে যায় না, গুরুগৃহে তার স্থান হবে না, গণিকালয়ের চৌহদ্দির ভিতরেই সে পৃথিবীকে চিনে নেয়।

লিচ্ছবীদের চিরশত্রুর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার অপরাধে আশ্রপালী জাতিচ্যুত—কেউই আর আসে না সেই উর্বশীবিনিমিত্তার সঙ্গসুখ কামনায়। তাতে আশ্রপালী আনন্দিতা। পুরুষসিংহ বিশ্বিসারের পর শিবাকুলের হৃদ্ধাধ্বনি তার সহ্য হত না—সে যেন, অগাধজলসঞ্চারী রোহিতমৎস্যের জলকেলির পর সফরির ‘ফরফরায়ণ’। সে

যেন মধ্যরাত্রের দরবারী কানাড়ার পর শেষপ্রহরের ক্লাস্তিকর চটল শিবাঙ্কনি।

দিন যায়। তারপর একদিন বৈশালীতে এলো গুরুত্বপূর্ণ সুসংবাদ। ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর ভিতর দিয়ে যাত্রা করবেন। এক রাত্রি বাস করে যাবেন ঐ মহানগরীতে। মহাপরিত্রাজক তখন পরিণত বয়স্ক, সমগ্র আর্য্যবর্তের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। লিচ্ছবীরাজ ধন্য হয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদ সুসজ্জিত করতে থাকেন এই আশায় যে, শাক্যসিংহ সশিষ্য তাঁর প্রসাদেই অতিথ্য গ্রহণ করবেন। কিন্তু বাদ সাধলেন ‘গণ’। তারা সুশোভিত করতে থাকেন অতিথিশালাটি। আশা—মহামানব গণ—এর অতিথ্য গ্রহণ করবেন। আশ্রপালী—বৈশালী নগরীর নটী—সেই যে মেয়েটি নাগরদোলায় দোল খেতে খেতে উপনীত হয়েছে অসম্মানের নিম্নতম পাতালে—সে নিশ্চিত জানে, রাজপ্রাসাদই হোক, অথবা অতিথিশালাই হোক, মহামানবকে প্রণাম জানাতে সে কোথাও যেতে পারবে না। সে সব স্থলে সমাজতন্ত্রের আর প্রবেশাধিকার নাই। উপেক্ষিত হতভাগিনী রওনা হল নগরপ্রান্তে বুদ্ধদেবকে প্রণাম জানাতে। সঙ্গে তার কানীন পুত্র জীবক।

বৈশালী নগরসীমান্তে এক আশ্রকাননে সশিষ্য অধিষ্ঠান করছেন মহাকারুণিক। এ সেই আশ্রকানন, যেখানে দীর্ঘদিন পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিল অযোনিসম্ভবা আশ্রপালী। আজ সে উদ্যান লোকে লোকারণ্য। ‘লোকুন্তম’ একটি পাষাণচত্বরে প্রলম্বিতপদমুদ্রায় ধ্যানমুগ্ধ। তাঁকে ঘিরে বসেছেন অযুত ভক্ত। বামদিকে তাঁর শিষ্যবৃন্দ—সারিপুত্ত, মহামৌদগল্ল্যানন, আনন্দ; দক্ষিণদিকে মহারাজ মহানাম এবং গণ—এর প্রতিনিধিরা। আশ্রপালী অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জনারণ্যের একান্তে আত্মগোপন করতে চায়; কিন্তু ঈশ্বরদত্ত রূপই তার কাল হল। সভাস্থ সকলেই লক্ষ্য করল সেই পাণ্ডিত্যকে। কী সাহস! কানীন পুত্রটিকেও সঙ্গে করে এনেছে।

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর লোকুন্তমের ধ্যান ভঙ্গ হল। রুদ্ধশ্বাস জনতা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে। জনতার প্রথম সারি থেকে একযোগে দণ্ডায়মান হন—মহারাজ মহানাম এবং গণপ্রধান। উভয়েই যুক্তকরে কিছু নিবেদন করতে চান। কিন্তু তার পূর্বেই জনতার লক্ষ্য হল—মহাকারুণিকের করুণাঘন দৃষ্টি নিপতিত হয়েছে জনারণ্যের শেষপ্রান্তে এক অশ্বেবাসিনীর উপর, নির্নিমেষলোচনে যে এতক্ষণ দেখছিল মহামানবকে। শাক্যসিংহ সহাস্যে বললেন, আশ্রপালীকে! বৈশালী নগরীতে অদ্য রাত্রি অতিবাহিত করতে চাই। তোমার সর্বতোভদ্রে আমার ঠাই হবে?

পরিবর্তে সভাস্থলে বজ্রপাত হলেও জনতা এমন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হত না।

‘সর্বতোভদ্র’। সর্বশ্রেষ্ঠ ভদ্রাসন! ঘৃণিত রাজনটীর গণিকালয়!

আশ্রপালী উঠে দাঁড়াল। কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে এল। কি যেন বলতে গেল। পারল না। ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল তার। নতজানু হয়ে বসে পড়ল ওঁর পদপ্রান্তে।

মহাভিক্ষু সারিপুত্ত বললেন, জীবকমাতা! ভগবান বুদ্ধ তোমার গৃহে অতিথি হতে দেবদাসী ৩৬

ইচ্ছাজ্ঞাপন করছেন। তুমি তাঁকে আমন্ত্রণ করবে না?

না। পারবে না! কিছুতেই পারবে না। সেই পতিতালয়ে সে কেমন করে আহান জানাবে ‘লোকুন্তম’কে? হতভাগিনী তার অনিন্দ্য আননটি নামিয়ে আনে যুগলচরণে—আযৌবনের অযুত পুরুষসঙ্ভোগের ক্রন্দ অশ্রুর বন্যায় ধৌত হয়ে গেল।

লিচ্ছবীরাজ ও ‘গণ’-এর পরাজয় ঘটল আবার। সেই ঘৃণিতা দুর্বিনীতা রাজনটী—যে আশ্রয় দিয়েছিল লিচ্ছবীদের চিরশত্রুকে, যে সেই মহাপাষণ্ডের বীর্যকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করে পাপের পসরা পূর্ণ করেছে, সেই কলঙ্কিনীরই জয় হল আবার।

ভগবান বুদ্ধ সশিষ্য অতিথি হলেন নটীর। পিট্‌ককার বলেননি—আশ্চর্য কেন বলেননি— সে রাত্রে ভগবান বুদ্ধ কী উপদেশ দিয়েছিলেন সেই কনীন পুত্রের জননীকে! বস্তুত কোনও উপদেশ যে দিয়েছিলেন এমনও ইঙ্গিত নেই। বোধকরি আশ্রপালীর অন্তরে এমন একটি আকৃতি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যার জন্য মৌখিক উপদেশ ছিল বাহুল্য। বুদ্ধদেব বেশ্যালয়ে রাত্রিযাপনান্তে পরদিন পুনরায় পথে বার হলেন। এমন কত কত পুরুষই তো সন্তোষরাত্রিশেষে যাত্রা করছে প্রাসাদ ত্যাগ করে; কিন্তু এ প্রস্থান তো শুধু প্রস্থান নয়, এ যে আশ্রপালীর জীবনে এক মহাভিনিক্ষমণ!

বুদ্ধদেব নগরসীমা অতিক্রম করার পূর্বেই তুলুষ্ঠিত হল রাজনটীর ঘন কৃষ্ণ কেশরাশি। পীত চীবরধারিণী ভিক্ষাপাত্র হাতে তার পূর্বেই বার হল পথে—তার হাত ধরে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে কনীনপুত্র জীবক। দুজনের যৌথ-পুকারে ঝনিত হয়ে উঠেছে বৈশালীর রাজপথ: প্রভু বুদ্ধ লাগি, আমি ভিক্ষা মাগি—

বিস্মিয়ারের অভিসারে বৈশালী লাভ করেছিল একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন: জীবক। শাক্য সিংহের অভিনিষ্ঠমণে বৈশালী লাভ করল আর একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন: একটি মহাসজ্জারাম নগরীর কেন্দ্রস্থলে।

প্রাক্সন্ন্যাসজীবনে যে প্রাসাদের পরিচয় ছিল :

আশ্রপালীর বেশ্যালয়!

সেই সর্বতোভদ্র!

যদি বলি বুদ্ধদেবের কাল থেকে কৌটিল্যের কালের ব্যবধান দু’তিনশ বছর, তাহলে সময়ের ব্যাপ্তিটাকে ঠিকমতো বোঝানো যাবে না। সে আমলের দুশ বছরের ব্যবধান সিরাজউদ্দৌলার আমল থেকে আমাদের কালের ব্যবধানের সমান নয়—অঙ্কের হিসাব যাই বলুক। শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীই তখন অগ্রসর হত মরালগতিতে—গোয়ানে, নৌকায়। তাই কৌটিল্যের কালেও গণিকা তথা দেবদাসীদের জীবনযাত্রা মোটামুটি বৌদ্ধযুগের অনুরূপই ছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখছি, ব্যবস্থাপনাটির আমূল পরিবর্তন করা হল। কৌটিল্য

অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধির অর্থনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি বুঝে নিলেন—গণিকাবৃত্তিকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করে না নিলে রাজতন্ত্রের সমূহ ক্ষতি। গণিকা সমাজের ‘নেসাসারি ইন্ডল’, আবশ্যিক উৎপাদ! তাকে বাদ দেওয়া চলবে না; অথচ দেখা যাচ্ছে, তারা সমাজের উচ্চকোটির অর্থসংগ্রহ করে ক্রমশ ক্ষমতাবান হয়ে উঠছে। অর্থে এবং প্রতিপত্তিতে। আশ্রপালীর প্রাসাদ রাজ প্রাসাদের সমতুল্য হয়েছিল এবং আশ্রপালী তার আত্মজীবনের সঞ্চয় দান করে গিয়েছিল বৌদ্ধ সম্ভারামকে—যে অর্থ মূলত রাজতন্ত্রের। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে তাই এদিকটা বেঁধে দিলেন। সমস্ত ব্যবস্থাটা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এনে ফেললেন। গণিকাবৃত্তিকে দু ভাগে বিভক্ত করে বৃহত্তর অংশটিকেই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করলেন। দু ভাগে নয়, তিন ভাগে।

প্রথম ভাগ—দেবদাসী! তাদের সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র প্রায় নীরব। পুরোহিত-তন্ত্রের সঙ্গে রাজতন্ত্রের সংঘাত এড়াতে তিনি দেবদাসীদের সম্বন্ধে আদৌ কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। মন্দির-পুরোহিত তাদের নিয়ন্ত্রণ করবেন।

দ্বিতীয় ভাগ—স্কুল্লিশ্য। তারা সহজিয়া—থাকবে নগরের বাহির দিয়ে। সাধারণ পণ্যা নারী যারা আপ্যায়ন করবে সাধারণ মানুষকে। স্বল্পতর মূল্যে। তাই বলে তারা আইনের আওতার বাইরে নয়। তারা তাদের মাসিক উপার্জনের ভিতর থেকে দুইদিনের রোজগার সরকারকে দিতে বাধ্য থাকবে। পরিবর্তে রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

তৃতীয় ভাগ—অবরুদ্ধ। তারা আবার দু-জাতের। একদল বিশেষ বিশেষ পরিবারভূক্ত রক্ষিত। রাজা-শ্রেষ্ঠী-ধনকুবেররা তাদের ভরণ-পোষণ করবেন। তারা মনিবের প্রাসাদেও থাকতে পারে, অথবা বাগানবাড়িতে; কিন্তু ‘পরিবারগত সতীত্ব’ তাদের মেনে চলতে হবে। দ্বিতীয় দল সর্বজনভোগ্য গণিকা বা বারাক্ষনা। তারা সর্বতোভাবে ‘সরকারী চাকুরে’। তফাত এই, তারা রিজাইন দিতে পারত না। রূপ ও গুণের বিচারে গণিকাদের তিনটি শ্রেণী। নিম্নতমদের বার্ষিক মাহিনা—শব্দটা ছিল ‘ভোগ’—হাজার কর্ষাপ।

দেবদাসী ভিন্ন অপর সকল জাতের দেহজীবিনীদের তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়োগ করা হল একজন অফিসারকে : গণিকাধ্যক্ষ। প্রতিটি গণিকালয়ের দায়, আয় ও ব্যয়ের হিসাব গণিকাধ্যক্ষ সরকারে দাখিল করতেন। কেন্ জাতের পতিতা তার অতিথির কাছ থেকে কী পরিমাণ নগদ অর্থ দাবি করবে তা অধ্যক্ষই স্থির করে দিতেন—এবং সে অর্থ নিশাস্তে গণিকা হস্তান্তরিত করত অধ্যক্ষের প্রতিনিধিকে। ঠিক যেমন স্টেট-বাসের কন্ডাক্টর তার দৈনিক উপার্জন দিনান্তে বুকিয়ে দেয় ডিপোয় ফিরে এসে। কিন্তু নাগর যদি অর্থের অতিরিক্ত কোনও প্রয়োগহার দেয়—স্বর্ণালঙ্কার হলেও—তা গণিকার নিজস্ব! এবং সেটা স্বয়ং রাজাও আইনত বাজেয়াপ্ত করবার অধিকারী নন!

কৌটিল্য অতি সময়ে এই পরিকল্পনা রূপায়িত করেছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

গণিকার সম্ভাবন হলে তার দায়দায়িত্ব সরকারের। কন্যা হলে সে হবে ভবিষ্যতের গণিকা, পুত্র হলে—কুশীলব: অর্থাৎ সরকারের নিজস্ব রক্ষণালীর নট অথবা কর্মী। গণিকাদের পেনশনের ব্যবস্থা ছিল—এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন। যৌবন গেলেও জীবন থাকে—এতদিন রূপোপজীবিনীদের সেই জীবনের শেষাংশ ছিল অত্যন্ত বেদনাবহ; কৌটিল্যের কৃপায় এখন থেকে সেই অনিশ্চয়তা ঘুচল।

যদি কোনও নাগর বিশেষ কোনও গণিকাকে সাময়িকভাবে নিজ প্রাসাদে নিয়ে যেতে চায়, তাতে আপত্তি নেই। সে-ক্ষেত্রে নাগরকে গণিকার মাসিক উপার্জনের সওয়াশত প্রতি মাসে সরকারে জমা দিতে হবে। গণিকা যদি তার এই বন্দীজীবন থেকে মুক্তি চায়, তাহলে তাকে চব্বিশ হাজার কার্ষাপণ মুক্তিমূল্য দিতে হবে। যে হতভাগিনীর বার্ষিক আয় তিন হাজার পণ-এর কম, তার পক্ষে এটা স্বপ্ন-কথা।

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে গণিকা এবং তার নাগরদের স্বার্থরক্ষার জন্য চুলচেরা আইন লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিবেকের বালাই ছিল না এই অর্থনীতিবিদের। রাষ্ট্রের যাতে সুবিধা সেই মোতাবেক আইন করেছেন—গণিকা ও তার নাগরের যৌকু স্বার্থ দেখা হয়েছে, তা এই ব্যবস্থাপনার স্বার্থেই। অর্থাৎ রাজতন্ত্রের স্বার্থেই। যেমন ধরুন, গণিকালগ্নে মস্তাবস্থায় বা স্বেচ্ছায় যদি কোন নাগর রূপোপজীবিনীকে হত্যা করে বসে, তবে তার জরিমানা হবে বাহাস্তর হাজার পণ—অর্থাৎ মুক্তিপণের তিনগুণ।

অপরপক্ষে গণিকা যদি নাগরকে হত্যা করে তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড!

জীবনের দায়ের 'কারক' হলেও গণিকার যৌবনের দায় কৌটিল্য পুরোপুরি মিটিয়ে দিয়েছেন। যথা—শর্তানুযায়ী অর্থমূল্য গ্রহণের পরে রূপোপজীবিনী যদি চরম মুহূর্তে প্রাণিধান করে যে তার নাগর (রতিজ—?) ব্যাধিগ্রস্ত তাহলে সে নাগরকে প্রত্যাবাসন করতে পারে। এক্ষেত্রে সে অর্থমূল্য বা উপহার প্রত্যর্পণে বাধ্য থাকবে না। দ্বিতীয়ত নাগর যদি প্রতিশ্রুত অর্থদানে অস্বীকৃত হয় তাহলে বিচারে তাকে অতিগুণ অর্থ জরিমানা দিতে বাধ্য করা হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কানুন : গণিকা অর্থমূল্যে শুধুমাত্র সাধারণ রতিক্রিয়াতেই বাধ্য থাকবে। নাগর যদি চরম মুহূর্তে কোন প্রকার বিকৃত কামের বাসনা জ্ঞাপন করে তাহলে গণিকা তাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবাসন করতে পারবে এবং অর্থমূল্য প্রত্যর্পণে বাধ্য থাকবে না।

কৌটিল্যের কাল এবং গুপ্তযুগের মাঝখানে দুটি প্রামাণ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। প্রথমত বাসোয়নের 'কামসূত্র' এবং দ্বিতীয়ত ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'। বারবণিতাদের রীতি, আচার-ব্যবহার বিষয়ে সে-দুটি মহাগ্রন্থে আলোচনা আছে। কিন্তু আমাদের তা আপাতত বিস্তারিত আলোচনা না করলেও চলবে। কারণ দুটি গ্রন্থেই

বারবণিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে—‘দেবদাসী’ নিয়ে নয়।

ভারতীয় ইতিহাসের সুবর্ণযুগ—গুপ্তযুগে পদার্পণের পূর্বে আরও একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করতে হয়—শূদ্রকের মুচ্ছকটিক। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তা সাম্প্রতিককালে অভিনীত হয়েছে। সুতরাং সে কাহিনী বিস্তারে অলমিতি হতে হচ্ছে। শুধুমাত্র উল্লেখ করব, বসন্তসেনার সঙ্গে চারুদত্তের বিবাহে প্রমাণ হয় যে, সে আমলে সমাজ গণিকাদের আজকের মতো হীনদৃষ্টিতে দেখত না।

কালিদাসের মেঘদূতকাব্যে বর্ণিত উজ্জয়িনীর মহাকালমন্দিরে চামর বাদনরতা দেবদাসীদের আমরা দেখেছি। পদ্মাপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে লোভ দেখানো হয়েছে—মন্দিরে যদি কেউ দেবদাসী উৎসর্গ করেন তা হলে তাঁরা ইহলোকে মহাধনী এবং পরলোকে কল্পকাল স্বর্গবাসের অধিকার পাবেন। ভবিষ্যপূরণ সুপারিশ করছেন—সূর্যলোকপ্রাপ্তির সবচেয়ে ভালো উপায় হল, কোনও সূর্যমন্দিরে ভক্তিভরে কিছু বেশ্যা দান করা—

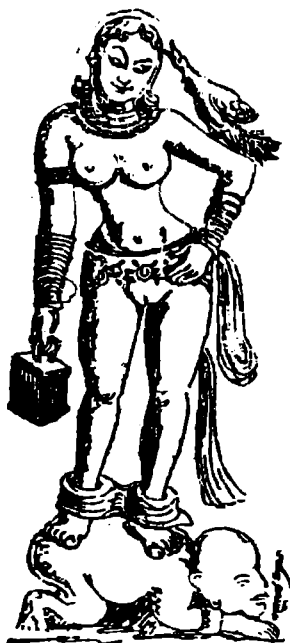
“বেশ্যাকদম্বকং যন্তু দদ্যাৎ সূর্যায় ভক্তিভঃ।

সগচ্ছেৎ পরমং স্থানং যত্র তিষ্ঠতি ভানুমান্।”

কিন্তু আর তথ্য নয়। আসুন একটু গল্পে শোনানো যাক্।

গুপ্তযুগ পর্বন্ত এসেছি। সুতরাং গুপ্তযুগের গল্পেই কাঁদি।

সুতনুকা আর দিব্যদত্তর শাশ্বত কাহিনী :



মহানগরী পাটলীপুত্র। অগ্গবিনতা ও রূপদক্ষের যে মৌর্যযুগীয় কাহিনীটি আমরা ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি, তারপর অনুমান সাত শতাব্দী অতিক্রান্ত। আর্যবর্তের সবকিছুই জঙ্গম। স্থাবর শুধু ঐ মহাকালের মন্দির এবং তার নাট-মন্দিরে দেবদাসীদের ভাগ্য।

পাটলিপুত্রের কেন্দ্রস্থলে মগধাধিপতির আকাশচুম্বী ত্রিভূমক রাজপ্রাসাদ। দুর্গপ্রতিম সুউচ্চ প্রাসাদ প্রাকারে সারি সারি ইন্দ্রকোষ। সেখানে অতল্লপ্রহরায় ধনুকী। সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ রাজপথ চতুমুখী। তার চতুষ্পার্শ্বে নাগরিক জীবনের নানান উপকরণ। মহাশ্ব-পাটলিকের অধিকরণ, সুরাধ্যক্ষ, শুক্রাধ্যক্ষ, আরক্ষাপতির ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ। চতুর্মহাপথের অন্যান্য বাহতে অজস্র

পশ্যবিপশী—চতুরস্র নাট্যগৃহ, পুষ্পবিপশী, সমাপানকক্ষ।

পথে বিচিত্র নরনারী। বিচিত্র তাদের বেশভূষা, যানবাহন। চতুর্মহাপথের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান এক বিদেশী বৌদ্ধ ভিক্ষু বিশ্বয়বিস্ফারিতনেত্রে লক্ষ্য করছিলেন আর্যবর্তের রাজধানীর জীবনযাত্রা। এ মহানগরীর যৌষিদ্‌বৃন্দও অতি বিচিত্রা। শেন্সি, হেননচ, চাঙয়ান—বসন্ত সমগ্র হানসাম্রাজ্যে যে রমণীদের দেখে এসেছেন আজীবন, তাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য প্রচুর—আকৃতি এবং প্রকৃতিতে। এদের আননে লোথরেণুর মৃদু প্রলেপ, নয়নে কঙ্কল, অধরোষ্ঠে মধু-মোম-কুঙ্কুম ও ইন্দুদি-তেলের বর্ণিকান্ত, কর্ণে শিরিষ, চূড়াপাশে কুরুবকগুচ্ছ, নিতম্বে রত্নখচিত মেখলা।

আজন্ম ব্রহ্মচারী ভিক্ষু তাও-চিঙ্ক জিতেদ্রিয়, কিন্তু প্রাক্সম্যাসজীবনে তিনি ছিলেন চৈনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য-দর্শনের অধ্যাপক।^১ সেটা পেশায়, নেশায় তিনি ছিলেন কবি। ফলে বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি তাঁর লক্ষ্য হলেও, তিনি সুন্দরের পূজারী। এবং সেজন্য পাটলিপুত্রে উপস্থিত হয়ে রীতিমতো সন্ধান করে বন্ধুত্ব করেছেন ভারতভূখণ্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিবরকে। ঘটনাক্রমে কবি তখন উজ্জয়িনীবাসী নন, আছেন পাটলিপুত্রে। বয়সের বাধা হয়নি। পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় ব্রাহ্মণকবি এবং পঞ্চাশোর্ধ্ব বৌদ্ধভিক্ষু

পরস্পরের বন্ধু। অন্যতরিলম্বে যাঁর প্রতীক্ষায় কালহরণ করছিলেন, সেই বয়স্যের আবির্ভাব ঘটল। শ্যামাঙ্গ, মুণ্ডিত মস্তক, স্বক্লে দীর্ঘ উপবীত, ললাটে শ্বেতচন্দনের ত্রিগুণ্ডক। সন্ধ্যাসমাগমের স্বল্পালোকেও তাঁর শুকচক্ষুনাশা এবং আয়ত উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় পরিদৃশ্যমান। বৌদ্ধভিক্ষুর সমীপবর্তী হয়ে কবি যুক্ত করে ক্ষমা চাইলেন, পথে আমার এক বিদগ্ধ বন্ধু^২ সূর্যসিদ্ধান্ত বিষয়ে এমন দুর্বোধ্য আলোচনা শুরু করলেন—

বাধা দিয়ে তাও চিণ্ড বলেন, সূর্যরশ্মিবিদগ্ধ আপনার বন্ধুর সিদ্ধান্ত যাই হোক সূর্যদেব এখনও অন্তর্মিত হননি। এমন কিছু বিলম্ব হয়নি।

অতঃপর উভয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মহাকালের হিন্দু মন্দিরটি দর্শনের বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন আগন্তুক। কবি পথপ্রদর্শক মাত্র। দু’-একটি ভদ্রাসনে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে উঠেছে। শঙ্খধ্বনিতে সন্ধ্যাদেবীর আগমনী। কবি বললেন, গোখলিলগ্নই মন্দির-দর্শনের উপযুক্ত সময়। তখন উদ্ভিন্নযৌবনা অনিন্দ্যকান্তি দেবদাসীর দল...

সহসা গতি সংবরণ করেন ভিক্ষু। কবি বলেন, কী হল?

তৎক্ষণাৎ মনস্থির করেন বৃদ্ধ। বলেন, না, কিছু নয়, চলুন।

—দেবদাসীর প্রসঙ্গেই কি আপনার...?

—হ্যাঁ। প্রবক্তা গ্রহণকালে প্রতিজ্ঞা করতে হয় : “নচগীতবাদিত বিসুকদম্ভসনা বেরমণী সিদ্ধাপদং সমাদিয়ামি।”^৩ কিন্তু কবিবর! এ বিষয়ে আমি আমার গুরুদেবের মতো কঠোরব্রতী নই। তখনই হুয়ান গুহা মন্দিরে একদল নর্তকী দেখেছিলাম লোকুত্তমকে শ্রদ্ধা জানাতে।^৪ কই, তাদের তো অশ্রদ্ধের মনে হয়নি।

অতীতিকর আলোচনা—অর্থাৎ বৌদ্ধ ও হিন্দুদর্শনের আগাতবিরোধটি পরিহার করে কবি বললেন, আপনার গুরুদেব কে? কোথায় আছেন তিনি?

—যাঁর সঙ্গে সেই সুদূর চীনখণ্ড থেকে বুদ্ধভূমিতে এসেছি। মহাভিক্ষু কা-হিসেন?

—তিনি বর্তমানে কোথায়?

—আপনি জানেন না? স্থানীয় মহাসম্মারামে। পাটলিপুত্রের প্রতি তাঁর কোনও আকর্ষণ নাই। শুধুমাত্র যেটুকু মহাকরুণিকের স্মৃতিথ্য, তাতেই তাঁর আগ্রহ।

মহাকাল মন্দিরের সম্মুখে প্রচণ্ড জনসমাবেশ। সন্ধ্যারতির শুভলগ্ন সমাগত। এ সময় প্রত্যহই যাত্রীদের ভিড় হয়। কিন্তু এ যে জনসমূহ। তার একটি বিশেষ হেতু আছে। জনশ্রুতি, মহাকাল মন্দিরের প্রধান দেবদাসী রুদ্রাণীর অদ্য শেষ নৃত্যরতি। অতঃপর ততদিন না নতুন কোনও দেবদাসী ঐ রুদ্রাণীর শূন্যপদে অতিথিত্ব হাছেন, ততদিন একক নৃত্যের আয়োজন বন্ধ থাকবে। বর্তমান রুদ্রাণীর বয়ঃক্রম আনুমানিক পঞ্চত্রিশাব্দিবর্ষ—অবসর গ্রহণের বয়স তাঁর হয়নি, রূপযৌবনও কানার কানায়; কিন্তু তাঁকে অকালে বিদায় নিতে হচ্ছে শূলপাণির ‘কালবৈশাখী’ নির্দেশে।

হয়তো কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। মহাকালের অনুদ শতজন দেবদাসী আছেন—

-ভূত্যা-দত্তা-হাতা-ভক্তাশ্রেণীর। অলঙ্কারা একজনই, তিনি রুদ্রাণী। দীর্ঘ বিংশতিবর্ষ পূর্বে 'লাজহরণ নৃত্যে'^৫ অভিষেক-অন্তে তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অভিষেক-রাত্রে সর্বালঙ্কারে ভূষিতা ষোড়শী উপস্থিত হয় নাট্যমন্দিরে, একবস্ত্রে। তার কণ্ঠে একটি অনতিদীর্ঘ শ্বেতমালিকা 'লাজমালিকা'; শুধু খই দিয়ে গাঁথা। এবং অলঙ্কারের যতই বাহুল্য থাক, সেই বিশেষ রাত্রে সে একবস্ত্রা। দর্শকসমাকীর্ণ নাট্যমন্দিরে ঐ একবস্ত্রা নর্তকীকে মৃদঙ্গের তালে তালে নাচতে হবে; তার দেহসুখমা বিকশিত হবে, কিন্তু প্রকাশিত হয়ে পড়বে না। সে বড় কঠিন নৃত্য! তেহাই-এর তালে তালে দ্রুতচ্ছন্দ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পান্না দিয়ে তাকে নাচতে হবে; আশ্বচ্ছ রক্তচীনাংশুকের ভিতর দিয়ে তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গের হিম্মোল শুধু আভাসে-ইঙ্গিতে অনুভূত হবে। তার যৌবন শুধু বিকশিত হবে, প্রকটিত হবে না। তারপর শেষ-সময়ের মাথায় যখন মৃদঙ্গ 'ধা' বলবে, তখন সে নুটিয়ে পড়বে সাষ্টাঙ্গে। প্রণতি জানাবে দেবাদিদেবকে, প্রধান পুরোহিতকে, দর্শকদের। স্বৈদম্মাত নর্তকী অতঃপর ধীর পদে উঠে যাবে গর্তগৃহে—নিজ কণ্ঠের লাজমালিকা পরিণে দেবে শিবলিঙ্গে। তারপর রুদ্ধ করে দেবে দ্বার—গর্তগৃহ এবং অন্তরালের মধ্যবর্তী কবাট। বেরিয়ে আসবে একটি কাঁকনপরা হাত—তাতে তার শেষ লজ্জাবস্ত্র!

প্রধান পুরোহিতের নির্দেশে সেই রক্তচীনাংশুকের অঞ্চলপ্রাণটি কর্তন করে তা দিয়ে একটি নিশান নির্মিত হবে। মন্দিরের বেতনভুক একঅঙ্ক সেই নিশানটি নিয়ে উঠে যাবে বিমানশীর্ষে।^৬ বাঢ়-গম্ভী-মস্তক পার হয়ে, ঝাপুরি-আমলক-ঘন্টা উত্তরণে উপনীত হবে মন্দির-শীর্ষে। নিশানটিকে অনুবিক্ষ করবে ক্ষজাদণ্ডে!

চীনাংশুকের ঝণ্ড-বিষণ্ডদর্শকেরা সগ্রহ করবে পুষ্পাস্থিতি হিসাবে। মাদুলি বন্ধনের উপবৃক্ষ সেই বস্ত্রখণ্ড। যাত্রী ও দর্শকদল বিদায় হলে প্রধান পুরোহিত একাকী ফিরে আসবেন মন্দিরে। সমগ্র মন্দির-চত্বর তখন নিস্তব্ধ। অন্তরালের এ প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রধান পুরোহিত আহ্বান করবেন: তোমার নৃত্যপূজার আমি সন্তুষ্ট হয়েছি রুদ্রাণী! দ্বার খোল!

দ্বার খুলে যাবে। ঘৃত প্রদীপের ভিমিত আলোকে নিরাবরণা দেবদাসী তার কৌমার্যের পশরটুকু সম্বল করে নির্গত হয়ে আসবে অতিবিস্তৃত হতে।

যতদিন ক্ষজাদণ্ডে ঐ নিশানটি অক্ষত থাকবে, ততদিন রুদ্রাণীই থাকবে মন্দিরের 'অলঙ্কার'। তারপর বছরে বছরে যেমন সেই প্রধানা দেবদাসীর যৌবন তিল তিল করে ক্ষয়িত হবে, তেমনি বছরে বছরে জীর্ণ হতে থাকবে কলসদণ্ডের সেই ক্ষজানিশান।

এরপর একদিন! কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে মহাকাল স্পষ্ট নির্দেশ দেবেন রুদ্রাণীর অবসর গ্রহণের কাল সমাগত! ঝড়ঝঞ্ঝার অবসানে সকলে অবাক হয়ে দেখবে নিশানটি অগহত! রুদ্রাণীর কাল শেষ। শেষনৃত্যে একবার প্রণতি জানিয়ে সে বিদায় নেবে।

এগিয়ে আসবে নতুন কালের নতুন রুদ্রাণী। সালঙ্কার। একবস্ত্র। কণ্ঠে দুষ্কণ্ড্র
লাজমালিকা। লাজহরণ-নৃত্যের নূতন নর্তকী!

আজিকার এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির কথা জানা ছিল কবির। তিনি বিপন্ন বোধ করেন।
এই জ্ঞানরণ্যে তিনি কেমন করে ঐ বিশিষ্ট বিদেশীকে নিয়ে নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করবেন?
সহসা একটি প্রৌঢ়া ভূত্যাশ্রয়ী দাসী অগ্রসর হয়ে আসে। কপোতহস্তে কবিকে
শ্রদ্ধাঞ্জলি করে বলে, স্বাগত ভট্ট। এদিকে আসুন।

কবি আশ্চর্য হলেন। প্রৌঢ়া তাঁকে সনাক্ত করেছে। বিদেশী বন্ধুর করগ্রহণপূর্বক তিনি
দাসীর অনুগমন করেন। চলে আসেন নাট্যমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে। সেটি পূর্বমুখী মন্দিরের
পশ্চিমাংশ। অভ্যঙ্গামী সূর্যের শেষ রশ্মিপ্রভায় সেখানে এখনও কনে-দেখা-আলো। কবি
সবিস্ময়ে দেখলেন একটি শোভাস্তম্ভের পাদমূলে এক অনিন্দ্যকান্তি পঞ্চদশী। সে কার
উপমা? বহু কাব্যে ঐ মূর্তিটির বর্ণনা কবি নিজেই করেছেন। বোধ করি কল্পনায় এমন
একটি নারীমূর্তিকে দর্শন করেই তাঁর লেখনী রচনা করেছিল : সৃষ্টিবাদ্যবধাতুঃ !

প্রায়-কিশোরীটি তাঁর পদপ্রান্তে নামিয়ে রাখে স্পর্শ বাঁচানো একটি সলজ্জ প্রণাম।
ভিক্ষু তাও-চিঙ্কণেও প্রণাম করে। তারপর করজোড়ে নিবেদন করে, আপনারা এই
পিছনের দ্বার দিয়ে নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করুন নচেৎ—

কবি প্রশ্ন করেন, তুমি কি আমাকে চেন?

সলজ্জ কৌতুকময়ী প্রতিপ্রণটি নিবেদন করে, কবিবরের কি ধারণা শুধুমাত্র
“বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈঃ” উজ্জয়িনীর পৌরাঙ্গনা ভিন্ন আর কোন সামান্য সাধারণী
তাঁকে চেনে না?

কবি সর্কৌতুকে বলেন, দেবদাসীদলে তোমাকে কখনও দেখেছি বলে তো স্মরণ
হয় না! সেটাও কি তুমি সামান্য সাধারণী বলে?

মেয়েটি বলে, আমি নৃত্যের অধিকার লাভ করিনি আজও। আমার নাম সুতনুকা।

—সেটাও একটা বিষয়। জন্মমূহুর্তে তুমি সুন্দরী ছিলে নিশ্চয়ই, কিন্তু সুতনুকা
হয়েছো অনেক পরে। তবু তোমার পিতামাতা—

কনে-দেখা-আলোতেই মেয়েটিকে এবার স্নান দেখালো। বললে, জন্মকালে আমার
কী নামকরণ হয়েছিল জানি না। আমি—হুতা। এ-নাম মন্দিরের দেওয়া।

কবিও স্নান হয়ে গেলেন। অজ্ঞাতভাবে মেয়েটির একটি সংবেদনশীল স্থানে আঘাত
করে ফেলেছেন। মেয়েটি কিন্তু সেদিকে গেল না, পূর্বপ্রশ্নের বাকিটার উত্তরদান করে
সে, নৃত্যের অধিকার এতদিন ছিল না, তাই আমাকে কখনও দেখেননি। তবে এবার
সে-অধিকার আমি পাব। আগামী পূর্ণিমা রাত্রে। সেদিন আপনার আমন্ত্রণ রইল,
কবিবর।

—নিমন্ত্রণ! কিসের নিমন্ত্রণ!

—আমাকে সরাসরি রুদ্রাণীপদে উন্নীত করা হবে সেদিন। পূর্ণিমারাত্রি আমার অভিষেক।

কবির সংবেদনশীল অন্তরে এবার মেয়েটি যেন এক তীক্ষ্ণশলাকা বিদ্ধ করে দিল। মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন—সহস্র দর্শকের সম্মুখে ঐ উদ্ভিন্নযৌবনা পঞ্চদশী নৃত্যরতা— একবস্ত্রা সে—প্রতি পদক্ষেপেই সে সচকিতা হয়ে উঠছে! তারপর? লাজহরণ-নৃত্যের শেষ পর্যায়ে ঐ কাঁকনপরা হাতখানি শুধু বার হয়ে এসেছে রুদ্রদ্বারের ওপার থেকে! কিন্তু তারপর? তৎক্ষণাৎ কবির মানসপটে উদ্ভিত হল—মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সহস্রাক্ষের কদাকার দেহটি। পঞ্চাশোক্ষ লালসাজজর্জর যে বৃদ্ধটি এই দেবদাসীদের সর্বময় কর্তা! ধর্মের নির্দেশে যে বর্বর অসংখ্য দেবদাসীর কৌমার্য হরণ করে এসেছে এতাবৎকাল।

সুতনুকা প্রশ্ন করে, ভট্ট কবি! আপনাকে প্রণাম করলাম, কই আপনি তো আশীর্বাদ করলেন না?

কবি তখনও স্বাভাবিক হতে পারেননি। ‘ধর্মের নির্দেশে,’ না ‘ধর্মের অজুহাতে’? না-না-না! এ হতে পারে না। মহাকালের প্রতিভু সহস্রাক্ষ! সহস্রাব্দকালের এ-বিধান কখনও অকল্যাণকর হতে পারে না। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আশীর্বাদ করেছি, মনে মনে—

—কি সেই আশীর্বাদ? ‘মা ভূ দেবং ক্ষণমপি চ তে স্বামিনা বিপ্রযোগঃ?’^৭

ভুকুঞ্জন হল কবির। মেয়েটিকে একটু প্রগলভ মনে হল। একটু কঠিন শোনালো তাঁর কণ্ঠস্বর, তাই যদি হয়, ক্ষতি কি? তুমি তো দেবতার নির্দেশে দেবদাসী! আগামী পূর্ণিমায় রুদ্রাণী হতে চলেছ—তোমার স্বামী তো জগৎপিতা পরমেশ্বর শিব।

—আপনি ঠিক জানেন?

কবির ঐ কথাটা নিয়ে সুতনুকা পরে চিন্তা করেছে—‘জন্মমূহর্তে তুমি সুন্দরী ছিলে, সুতনুকা ছিলে না নিশ্চয়?’—তা ঠিক। জন্মকালে তার কী নামকরণ হয়েছিল সুতনুকা জানে না। এটুকু শুধু শুনেছে অতি শৈশবকালে সে হুতা। জানে না, এই প্রকাণ্ড আর্য্যাবর্তের কোন্ প্রান্তে, কার ঘরে সে ভূমিষ্ঠা হয়েছিল। সে কি অবন্তী, কাঞ্চি, পৌণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্তি? তার সেই অজানা-অচেনা জননী কি এই পঞ্চদশবর্ষ পরেও সেই অপহৃতা কন্যাটির কথা ভাবে? রাতে কাঁদে?

জ্ঞান হবার পর থেকে সে প্রত্যক্ষ করেছে এই মন্দিরের পরিবেশ। রুদ্রাণীকে পেয়েছে মায়ের মতো। কিন্তু যতই বয়ঃপ্রাপ্তা হয়েছে, ততই যেন রুদ্রাণীর সঙ্গে তার মানসিক সম্পর্কটা তিক্ততর হয়েছে। ইদনীং তো সে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন আর কিছু ভাবে না।

সুতনুকা যে পরবর্তী রুদ্রাণী এটা সকলেই জানত। সুতনুকাও। সেজন্য তাকে নানান বিদ্যা পারদর্শী করে তোলা হয়েছে আবাল্য। পুষ্পমাল্য রচনা, পূজাবিধি, সংস্কৃত সাহিত্য, নৃত্য-গীত ও অন্যান্য চারুকলায়। অসামান্য রূপসী সে; আর সেজন্য তাকে একটি ইতিহাস রচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে—যে ঘটনা এই মন্দির-ইতিহাসে কখনই ঘটেনি ইতিপূর্বে। কোনও দেবদাসীই কখনও ‘অভিষেক-রাত্রি’ সরাসরি নিযুক্তা হয়নি রুদ্রাণীর পদে। এ যেন সৈন্যদলে নাম লেখানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সেনাধক্ষ্যের আসন অলঙ্কৃত করা। কিন্তু সহস্রাঙ্কের সেটাই ছিল পরিকল্পনা। আগামী পূর্ণিমারাত্রি ঐ উর্বশী-বিনিন্দিতা পঞ্চদশীকে অভিষিক্ত করবে সরাসরি রুদ্রাণী-পদে।

বাল্যে ও কৈশোরে এটাকে সে মহাসৌভাগ্যের দ্যোতক বলে মনে করত। কিন্তু তারপর কোথা দিয়ে কী যেন ঘটে গেল! বয়ঃসন্ধিকালে ওর জীবনে ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা। আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল তার চিন্তাধারায়। নিজের অজ্ঞাতসারে একটা মহান সত্যকে সে আবিষ্কার করে বসল। নিজেকে আবিষ্কার করল একটা মুগ্ধ তরুণের দৃষ্টির দর্পণে!

তক্ষশীলা থেকে এসেছিল এক প্রখ্যাত ভাস্কর। প্রখ্যাত, কিন্তু তরুণ। সে আজ দুই বৎসর পূর্বেকার কথা। সহস্রাঙ্ক তাকে নিয়োগ করলেন মন্দিরগায়ে কিছু মূর্তি উৎকীর্ণ করার কাজে। একের পর এক মূর্তি গড়ে যেতে থাকে ভাস্কর। তার সম্মুখে দেবদাসীদের উপস্থিতি হতে হয় পর্যায়ক্রমে। শিল্পীর নির্দেশে বিচিত্র ঠামে দাঁড়াতে হয়। দেখে দেখে ভাস্কর মূর্তি গড়ে। সুতনুকা তাদের মুখে শোনে ভাস্করের কথা। কৌতূহল হয় তার। কিন্তু সে আইনানুগ দেবদাসী নয়। তার অভিষেক হয়নি, তাই পরপুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিতি হবার অধিকার তার নাই। সহস্রাঙ্ক সম্মতি দেননি। তারপর একদিন। ভোগ-মণ্ডপের গবাক্ষের ফাঁক দিয়ে সে দেখল রূপদক্ষকে। আর তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত দেহে যেন এক তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল। ইচ্ছে হল—না! আজ আর তার মনে পড়ে না, সেই খণ্ডমুহূর্তে তার কী ইচ্ছা জেগেছিল। তবে তারপর থেকেই বারে বারে সে গোপনে লক্ষ্য করেছে উদাসীন ভাস্করকে। কটিমাত্র বস্ত্র পরিধান করে ঘর্মস্নাত রূপদক্ষ ক্রমাগত পাথরে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে।

আশ্চর্য! সেই পরুষ আঘাতে কেমন করে প্রস্ফুটিত হয় পাষাণবক্ষে এই কমলীয় সুখমা?

তারপর একদিন সহস্রাঙ্ক অনুমতি দিলেন। জনশ্রুতি, রূপদক্ষ এবার তক্ষশীলায় প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক। দুই বৎসরের পারিশ্রমিক সে দাবি করেছে সহস্রাঙ্কের নিকট। এতদিন সে ঐ অর্থ গচ্ছিত রেখেছিল প্রধান পুরোহিতের কোষাগারে। সহস্রাঙ্ক নাকি তাকেও বলেন, মন্দিরের প্রধান প্রবেশতোরণে সুতনুকার একটি মূর্তি উৎকীর্ণ করলেই তিনি রূপদক্ষের সকল অর্থ এককালীন মিটিয়ে দেবেন। দুর্জনে আরও বলে—সহস্রাঙ্ক দেবদাসী ৪৬

কুশীদজীবী। তিনি ঐভাবে কিছু কালহরণ করতে চেয়েছিলেন মাত্র।

তখনই চারিচক্ষুর প্রথম মিলন। পঞ্চদশী সূতনুকা আর বিংশতিবর্ষীয় রূপদক্ষ দেবদ্বিম।

পুরোহিতের নির্দেশে রূপদক্ষের সম্মুখে প্রতিদিন দাঁড়াতে হয়। মালতী থাকে পাহারায়। দেবদ্বিম মুগ্ধ। প্রথম দিন সে শুধু নয়নভরে ওকে দেখল। সম্মুখ থেকে, পাশ থেকে, পশ্চাৎ থেকে। সূতনুকা কৌতুক বোধ করে। কথা বলে না। ক্রমে দেবদ্বিম একটি প্রকাশ কষ্টিপাথর নির্বাচন করল। কিন্তু মূর্তিগড়া শুরু করল না। ক্রমাগত পাষণপটে ওর আলেখ্য ঐকে চলে। আঁকে আর মোছে। আঁকে আর মোছে। একমাস এইভাবেই অতিবাহিত হয়।

আর ধৈর্য থাকে না সূতনুকার। বলে, তুমি মূর্তি খোদাইয়ের কাজ শুরু করছ না কেন?

—ধ্যানে তোমার মূর্তিটা ধরতে পারছি না বলে।

—ধ্যান? ধ্যান কেন? আমি তো স্বয়ংই রয়েছি তোমার চর্মচক্ষুর সম্মুখে।

—তুমি জান না সূতনুকে! তোমাকে উপলক্ষ করে আমি যে মূর্তিটি সৃজন করব, তা সহস্র বৎসর পরেও দর্শককে মুগ্ধ করবে! আমার সে-মূর্তি আভাসে-ইঙ্গিতে সেকথাই বলবে, যা বলবার জন্য জগৎপিতা তোমার প্রতিটি অঙ্গ এমন কানায় কানায় ভরে দিয়েছেন।

সৌন্দর্যের সুখ্যাতি শুনলে—বিশেষ করে তরুণবয়স্ক শিল্পীর মুখে —কোন পঞ্চদশী না খুশিয়াল হয়ে উঠে? সূতনুকা সকৌতুকে জানতে চায়, কী বলবে সে?

—বলবে, এই মরণশীল জগতে আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করার মন্ত্রটি পেয়েছি।

কৌতুহলী মেয়েটি বলে, তা কেমন করে সম্ভব?

রূপদক্ষ তখন বুঝিয়ে বলতে থাকে তার শিল্প-পরিকল্পনার মর্মার্থ।

সূতনুকাকে আদর্শ করে সৃষ্টি করবে এক যক্ষিণীর মর্মরমূর্তি। তার পদতলে মৃত্যু-অসুর পিষ্ট হচ্ছে—যক্ষিণী মৃত্যুঞ্জয়ী। না ব্যক্তিগত জীবনে মৃত্যুকে সে জয় করেনি—সেও তোমার-আমার মতই মরণশীল। লক্ষ্য করে দেখ না ওর চরণের অলঙ্কারটিকে! ওটা তো একজোড়া নুপুর নয়—ওটা শৃঙ্খল! পরাজিত মৃত্যু-অসুর ওকে স্থাবর করে রেখে তবে প্রাণ দিয়েছে। যাতে সে মৃত্যুকে অতিক্রম করতে না পারে। তা হোক, তবু দার্শনিক বার্গসঁ যাকে বলেছেন, জীববিবর্তনের পথে ‘অমৃত’—Elan Vital, সেই অমৃতের অধিকারিণী হয়েছে ঐ চলচ্ছক্তিহীনা শৃঙ্খলিতা মুক্তা মেয়েটি। ব্যক্তিগত নয়, প্রজাতিগত জীবনে সে মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে। তুমি-আমি মরব, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে নূতন জীবনও যাব সৃষ্টি করে। মৃত্যুর কাছে প্রজাতিগতভাবে মানুষ হার মানবে না। যৌবনের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে তাই ঐ সূতনুকা ঘোষণা করেছে নন্দনতত্ত্বের মূল

কথা,— প্রজ্ঞান তত্ত্বের কথা! মৃত্যু যদি হয় মরণশীল দুনিয়ার শেষ কথা, তবে সে ঘোষণা করবে নন্দনতত্ত্বে প্রজ্ঞাতিগত শেষতর কথা! ওর দক্ষিণ হস্তে থাকবে একটি পিঞ্জর— কিন্তু মৃত্যু যেভাবে তাকে ব্যক্তিগতভাবে শৃঙ্খলিত করেছে, সে সেভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ করবে না তার দয়িতকে। ও জানে পিঞ্জর নিষ্প্রয়োজন— প্রেমের অচ্ছেদ্য অদৃশ্য বন্ধনে ওর পোষা শুকপাখি ওকে সোহাগ জানাবেই। মৃত্যু যদি হয় মরণজীবনের অন্তরস, তবে ঐ রসিকা সন্ধান দেবে অ-মরণজীবনের আদিরসের।

না, এ ভাষায় বলেনি। এ ব্যাখ্যাও দেয়নি।^৪ সে কি বলেছিল আর সুতনুকা কী বুঝেছিল তাও জানি না। তবে এটুকু সুতনুকা উপলব্ধি করেছিল—সে ঐ রূপদক্ষকে ভালবেসে ফেলেছে। বিহ্বলভাবে সে শুধু জানতে চায়, তাহলে সে মূর্তি নির্মাণ শুরু করছে না কেন?

—কেমন করে করব? তোমার সেই বাধাবন্ধনহীন মৃত্যুঞ্জয়ী মূর্তিটা যে আমার ধ্যানে ধরা দিচ্ছে না।

—বাধাবন্ধনহীন!—প্রশ্ন নয়; এটা সুতনুকার কঠিনঃসূত একটি আত্মজিজ্ঞাসা। কিন্তু দেবদ্বন্দ্ব মনে করল এটি প্রশ্নবোধক। তাই স্নান হেসে বলল, হ্যাঁ লাজহরণনৃত্যান্তে যে দৃশ্যটা সহস্রাক্ষ তার সহস্র নয়ন মেলে দেখবে, আমাকে সেটাই দেখতে হবে,—ধ্যানে।

এর পরের ঘটনাটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বেদনাবহ। সুতনুকা আজও জানে না কেন সে অমন দুঃসাহসিক আমন্ত্রণ জানিয়েছিল রূপদক্ষকে। সে কি শিল্পের অনুরোধে? একটি মৃত্যুঞ্জয়ী শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণায়? নাকি শিল্পীকে তার মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে? অথবা— স্বীকার করতে লজ্জা হয়, সে কি নিজেই চেয়েছিল একটি মুগ্ধ প্রেমিকের দৃষ্টির সম্মুখে নিরাবরণা ফোটা কদমের মতো আনন্দ-শিহরণে রোমাঞ্চিত হতে। কিন্তু পারেনি। সহস্রাক্ষের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হতভাগিনী চরম মুহূর্তে ধরা পড়ে যায়।

প্রাক-অভিষেক দেবদাসীর অসূর্যম্পশ্যা অনাদ্রাতা সৌন্দর্য মর-মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হওয়া শুধু অপরাধ নয়, পাপ! সে দেবতার সম্পত্তি! যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্রের বন্ধিম পথে সে-তীর্থে উপনীত হওয়ার একমাত্র অধিকারী প্রধান পুরোহিত। সহস্রাক্ষের পুরোহিত তন্ত্রের এই নির্দেশ। যে নির্দেশ স্বয়ং রাজা অবনতমস্তকে স্বীকার করেন। দেবদ্বন্দ্বকে তৎক্ষণাৎ বিতাড়ন করল সহস্রাক্ষ। বলা বাহুল্য, তার প্রাপ্য অর্থ বাজেয়াপ্ত করে। দুর্জনে এও বলে যে, সমস্ত ঘটনাপরম্পরাই সহস্রাক্ষের সূচতুর পরিকল্পনা অনুযায়ী।

বন্দিনী হয়ে রইল সুতনুকা লাজহরণ-নৃত্যের প্রতীক্ষায়।

সুতনুকার ঐ কথাটা নিয়ে কবিও পরে চিন্তা করেছেন : আপনি ঠিক জানেন?
না, কবি জানেন না। স্বীকার্য, এই ব্যবস্থাটা সহস্রাব্দিকাল সমাজ মেনে এসেছে।

মেনে এসেছেন রাজেন্দ্রবর্গ, মেনে এসেছে ‘গণ’, মেনেছে পঞ্চায়েত, ‘সভা’, ‘সমিতি’। এবং আজ পর্যন্ত কোনও জ্ঞানীশুণী পণ্ডিত এ নিয়ে প্রতিবাদ করেননি। স্বামী ভার্গব, মনু, বাৎস্যায়ন, ভরত, কেউই বলেননি— কোন যুক্তিতে ঐ অনাঘ্রাতাকে বলি দিতে হবে তার পিতার বয়সী এক কামার্ত বৃদ্ধের লালসা-যুপকাষ্ঠে?

এমনিতেই পঞ্চকাল ধরে একটি মর্মপীড়াদায়ক চিন্তা তাঁর রাত্রের নিদ্রা হরণ করছে। তাঁর সদ্যসমাপ্ত কাব্যটি শ্রবণ করে মগধাধিপতি সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন—কাব্যটি সুসমাপ্ত নয়। নায়ক-নায়িকার বিবাহ দিয়েছেন তিনি সপ্তম সর্গে। কিন্তু মহারাজ বলেছেন, কাব্যে নামভূমিকায় যাঁর অবতীর্ণ হবার কথা তিনিই তো এখনও অনাগত! বিবাহেই কখনও শেষ হতে পারে মিলনান্তক কাব্য? তার পরের অধ্যায়? কবিকে ‘অষ্টম সর্গ’ রচনা করতে হবেই।

কবি বিভ্রান্ত। জগৎপিতা এবং জগন্মাতার দৈহিক সঙ্গম কি সন্তান বর্ণনা করতে পারে? তাঁরা যে বাগর্থের মতো সর্বদাই সম্পৃক্ত।

মস্যাধার ও ভূর্জপত্র সাজিয়ে নিয়ে কবি দ্বিপ্রহরেই বসেছেন তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। একটি প্রহর সম্যকায়শিরগ্রিব হয়ে পদ্মাসনে বসে আছেন—একটিমাত্র পংক্তিও রচনা করা হয়নি। মনের দ্বন্দ্ব অপনোদিত হচ্ছে না! রাজাদেশে তিনি প্রাণ দিতে পারেন—কিন্তু কাব্যসরস্বতীকে লাজহরণ-নৃত্যের আসরে নামাতে পারেন না! এই মানসিক অবস্থায় সূতনুকার ঐ মারাত্মক প্রশ্নটি তাঁকে ব্যাকুলতর করে তুলল: আপনি ঠিক জানেন?

সন্ধ্যা সমাগত। দূর থেকে ভেসে আসছে মহাকাল মন্দিরের সন্ধ্যারতির রেশ। দিবালোক মিলিয়ে আসছে। রচনা করতে হলে এইবার ওঁকে গাত্রোত্থান করতে হয়—ঘৃত প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত করতে হয়।

কবি গাত্রোত্থান করেই সচকিত হয়ে ওঠেন। উন্মুক্ত দ্বারপথে একজন পূর্ণমৌখীনা রূপসী পূর্বমুহূর্তেই প্রবেশ করেছে সেই নির্জন গৃহে। কবির দিকে গিছন ফিরে সে গৃহদ্বারে অর্গল বন্ধ করতে উদ্যত। কবি শুভ্রিত। পরমুহূর্তে রমণী কবির মুখোমুখি হলেন। অবগুষ্ঠন অপসারিত করে বলেন, আমার প্রণাম গ্রহণ করন, ভট্ট। আমি আপনার শরণাগত, সাহায্যভিক্ষার্থিনী।

—আপনি তো....আপনি তো মহাকাল মন্দিরের রুদ্রাণী?

—হিলাম। গতকল্য পর্যন্ত সেটাই ছিল আমার সামাজিক পরিচয়। কিন্তু কবির কাছে আমি আজ আর একটু স্বীকৃতি পেতে ইচ্ছুক। আমি মায়ের জাত।

কবি কি বলবেন ভেবে পেলেন না। এই নির্জন রুদ্ধদ্বারকক্ষে নৈশ অভিসারিকাকে কী-ই বা বলা যায়? ইতস্তত করে শুধু বলেন, এখানে আমি সম্পূর্ণ একাকী—কল্যাণে আমি যদি মন্দিরে উপস্থিত হই?

—না! সর্বত্রই সহস্রাক্ষের চর! এখানেই! এই মুহূর্তেই.....

বিনা আপ্যায়নেই আগন্তুকা ভূমিতলে উপবিষ্টা হন। সময় অল্প, পরিবেশও অনুকূল নয়, তবু স্বল্পভাষে রুদ্রাণী উন্মুক্ত করে দিলেন তাঁর মাতৃহৃদয়।

রুদ্রাণী আজ দুই দশক মহাকাল মন্দিরের ‘অলঙ্কার’, শ্রেষ্ঠা নটী। তার পূর্বে আরও এক-দশক তিনি বন্দিনী ছিলেন শিক্ষার্থীরূপে। দেহ মনের নিদারুণ অপমানে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জেনেছেন—দেবদাসী-জীবনের অভিশাপকে। বহুভোগ্যার বিড়ম্বিত জীবনের সে কী নিদারুণ তিস্ততা! —ওরা স্বামী পায় না, সন্তান পায় না, শুধু ধর্মের অজুহাতে অযুত অজানা পুরুষকে দেহদান করে যায়। পুরোহিত-শ্রেষ্ঠী-বণিক-রাজা! প্রত্যক্ষভাবে তিনি জেনেছেন—দেবতা দেবদাসীর সেবা আদৌ চান না; এ শুধু একদল কামার্ত ষড়যন্ত্রকারীর যৌথ প্রচেষ্টায় নারীদেহরিরংসার আয়োজন। পুরোহিততন্ত্র আর রাজতন্ত্র পরস্পরের সহায়। সমাজ নির্বাক। শাসনয়নে বললেন, কবি, সূত্নুকে আমি গর্তে ধারণ করিনি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি তার মা! অথচ কী পঙ্কিল পরিবেশ দেখুন—সে ইদানীং আমাকে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভূমিকায় দেখে!

কবি সচকিত হয়ে বলেন, এসব কথা আমাকে কেন?

—দেবদাসী কোথায় আত্মগোপন করে আছে আমি জানি। সহস্রাক্ষের লালসাবহি থেকে আমি ঐ অপাপবিদ্ধাকে উদ্ধার করতে চাই। কবি, সমস্ত জীবন ধর্মের নামে পাপাচার করেছি, আজ অধর্মের নামে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করতে চাই। তাই এসেছি আপনার কাছে।

—কিন্তু আমি দীন কবি, আমার কাছে কেন?

—‘যাজ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লঙ্ককামা! ৭

একথার জবাব নেই। কবি চিন্তাশ্রিত হলেন। রুদ্রাণী বলে চলেন, শুনেছি ভিক্ষু ফা-হিয়েন আজ নিশাবসানে পাটলিপুত্র ত্যাগ করে তাম্রলিপ্তির পথে যাত্রা করবেন। ভিক্ষু তাও-চিঙ্কু আপনার বন্ধু। পলাতক কপোত-কপোতিকে যাতে ওঁদের অর্ণবপোতে আশ্রয় দেওয়া যায়, সেটুকু আপনাকে করে দিতে হবে। রাত্রের শেষযামে আমি স্বয়ং ওঁদের নৌকায় পৌঁছে দেব। সহস্রাক্ষ সমগ্র মগধ-সাম্রাজ্য তন্ন-তন্ন করে তন্নাশী করবে। কিন্তু মহাভিক্ষু ফা-হিয়েনের অর্ণবপোতে সে তন্নাশী করতে সাহস পাবে না।

মুহূর্তকাল কী-যেন চিন্তা করলেন কবি। মহাকালের মন্দির থেকে ভেসে এল একটা শব্দনির্ঘোষ! সহস্রক-ব্যাপী একটা সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে কবি বিহুল হয়ে পড়েছিলেন। এটা কি সম্ভব? ঐ শব্দনির্ঘোষে পিনাকপাণি যেন সায় দিলেন রুদ্রাণীর আকৃতিকে। কবির মুখমণ্ডল যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। যুক্তকরে বললেন, ভগবতি! যথাশক্তি শ্রেয়সে যতিস্যে!

পাটলিপুত্র মহাসঙ্ঘারাম থেকে যখন ব্যর্থমনোরথ হয়ে নিষ্কান্ত হয়েছিলেন কবি তখন মধ্যরাত্রি। সমস্ত নগরী তখন সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। জেগে ছিলেন ব্যর্থকাম পরাভূত এক কবি! এতবড় আঘাত জীবনে কচিৎ পেয়েছেন। কল্পনাই করতে পারেননি, এমন একটি সত্য-শিব-সুন্দর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। কিন্তু তাই হয়েছিল। বন্ধুবর ভিক্ষু তাও-চিঙ্-এর চেষ্টার ক্রটি ছিল না। কিন্তু ফা-হিয়েন ছিলেন তাঁর সঙ্কল্পে অটল।

এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে তিনি নাকি ন্যায়ত-ধর্মত বাধ্য। প্রথমত এটি চৌরকার্য, দ্বিতীয়ত হিন্দুধর্মদ্রোহিতা, তৃতীয়ত এতে 'মার'এর জয় এবং সর্বোপরি সুঅনুকা গৃহস্থঘরের অনুঢ়া কন্যা নয়—সে দেহোপজীবিনী শ্রেণীভুক্ত। নিতান্ত ঘৃণার্হ।

রুদ্রাণীকে দুঃসংবাদটা জ্ঞাপন করবার সময় ও সুযোগ নাই। সমস্ত রাত্রি নির্জন রাজপথে পদচারণা করেছেন কবি। ক্রমে শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। গঙ্গাতীরে পাষাণ রাণায় পদ্মাসনে বসলেন অবশেষে। লক্ষ্য হল, সন্ধ্যাকালে যে বৃশ্চিকরাশির চিরন্তন জিজ্ঞাসাকে দেখেছিলেন পূর্বগগনে সে নিশ্চিহ্ন হল পশ্চিম দিগন্তে। জিজ্ঞাসা অস্বপ্নিত, কিন্তু উত্তর কোথায়?

গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য অর্ণবপোত। মধুকর, সপ্তডিঙা, খরসান, ময়ূরপঙ্খী। তত্ত্বিন্ন স্থানীয় কিছু ক্ষুদ্রতর জলযানও ভাসমান—ডিঙি, দ্রোণা, পানসি, বালান, মান্দাস। কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুর পীতম্ভজাবাহী বিশাল অর্ণবপোতটি সহজেই সনাক্ত করা যায়। স্থির করলেন, এখানেই অপেক্ষা করবেন সূর্যোদয় পর্যন্ত। রুদ্রাণী এখনই আসবে পলাতক প্রেমিকমুগলকে নিয়ে; তার কাছে নিদারুণ দুঃসংবাদটি জ্ঞাপনান্তে ব্যর্থতার তিরস্কার নতমস্তকে গ্রহণ করে গৃহে প্রত্যাগমন করবেন।

ক্রমে পূর্বগগন আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুপ্তোখিত বিহঙ্গের কলকাকলীতে গঙ্গাতীর মুখরিত। কবি ধীরপদে ফা-হিয়েনের জলযান অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। সেখানে কর্মচাঞ্চল্য লক্ষণীয়—যাত্রার প্রস্তুতি।

কবিকে প্রথম দেখতে পেলেন ভিক্ষু তাও-চিঙ্। দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে এসে তিনি কবির করগ্রহণ করে বলেন, কবি! কোথায় ছিলেন সমস্ত রাত্রি? সঙ্ঘারাম থেকে নির্গত হয়ে মধ্যরাত্রিতে আপনি তো গৃহে প্রত্যাগমন করেননি।

—না, করিনি। কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন?

—আমি যে প্রহরে প্রহরে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি।

—কিন্তু কেন? কী হয়েছে?

—মহাকারণিক কল্পণা করেছেন! মহা-অর্হৎ মত পরিবর্তন করেছেন। সম্মত হয়েছেন।

—জয় শঙ্কর! তাহলে ওরা কোথায়?

—অর্ণবপোতের গোপন কক্ষে। রুদ্রাণী ওদের পৌছে দিয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন

করেছেন। আমরা এখনই যাত্রা করব। শুধু আপনাকেই সংবাদটা.....

—একবার তাহলে আমাকে ওদের কাছে নিয়ে চলুন।

কিন্তু তার পূর্বেই অগ্রসর হয়ে আসেন মহাপরিব্রাজক ফা-হিয়েন!

কবি তাঁকে প্রণাম করবার উপক্রম করতেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কবিকে তাঁর পঞ্জরসর্বস্ব বুকে টেনে নিলেন।

বললেন, কবিবর! তুমি আমার ভ্রান্তি অপনোদন করেছ। তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে মনটা বড় চঞ্চল হল। আমি খেরীগাথা¹⁰ গ্রন্থের সূত্রগুলি আবৃত্তি করতে উদ্যত হলাম। তুমি নিশ্চয় জান, তার প্রথম কবিতাটি মহাভিক্ষুণী আশ্রপালীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। সে গ্রন্থ আমার আদ্যন্ত কঠিন। কিন্তু কী আশ্চর্য! কী অপরিমিত আশ্চর্য! একটি শ্লোকও আমার স্মরণে এল না। অবসন্নচিত্তে শয্যাগ্রহণমাত্র অগঙ্গসেবিকা আশ্রপালী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। স্বপ্নে মাতা আশ্রপালী আমাকে ভৎসনা করে বললেন, “কুঙ্গ! ¹¹ খেরীগাথা আবৃত্তির অধিকার তুমি হারিয়েছ! কানীন পুত্রকে প্রত্যক্ষ করেও মহাকারুণিক আমার সেই পাপালয়কে বলেছিলেন: ‘সর্বতোভদ্র’; আর তুমি সূতনুকে প্রত্যক্ষ না করেই তাকে পাপিষ্ঠা বলেছ। মাতৃজাতির অপমান করেছ তুমি।”—

তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভঙ্গ হল আমার।

ভিক্ষু তাও-চিঙ্ক্রে প্রেরণ করলাম তোমার সন্ধানে।

ওঁরা তিনজনে প্রবেশ করলেন অর্ণবপোতের গর্ভে। নবদম্পতি যুগলে প্রণাম করল ওঁদের তিনজনকে। দেবদিনকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে কবি বললেন, রূপদক্ষ! তোমার সেই যক্ষিণী মূর্তিটি যুগযুগান্তকাল মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী প্রচার করবে—এই আশীর্বাদ করি।

সূতনুকা প্রণামান্তে প্রশ্ন করে, আর আমাকে? কী আশীর্বাদ করবেন?

কবি সকৌতুকে বলেন, তোমাকে তো সেদিনই আশীর্বাদ করেছি সূতনুকে! “মা ভূদেবং..”! কিন্তু আজ শুধু সে কথা নয়। ঐ দেখ সূর্য উঠছে, তাই বরং পরামর্শ দিই—

‘চক্রবাকবৎস এ আমভেহি সহঅরং উবট্ঠিআ রতনী!’ ¹²

বার্লার্ক সূর্যের আভায়ে —নাকি লজ্জায়—রক্তিম হয়ে ওঠে সূতনুকার গ শুদ্রয়।

কবি প্রেমিকযুগলের দুটি হাত একত্র করে বললেন, গঙ্গাবক্ষে, ব্রাহ্মণের বিধানে এ তোমাদের গান্ধববিবাহ! এ মিলন সার্থক হোক। শিল্পীর বীর্ষ্য আর সূতনুকার মাতৃস্নেহে জন্ম নেবে সেই ‘কুমার’—যে এই আসুরিক প্রথার অবসান ঘটাবে।

সূতনুকা অস্ফুটে যেন আপনমনে শুধু বললে, আপনি ঠিক জানেন?

কাহিনী আমার শেষ হয়েছে। বাকি আছে সামান্য উপসংহার।

কবির বাণী ব্যর্থ হয়নি। মহাজনক মহিষী সীবলীর তপস্যা যেমন বহু জন্ম অতিক্রম

করে সার্থক হয়েছিল রাষ্ট্রলজ্ঞানীর দাম্পত্য-জীবনে, তেমনি বহু জন্ম পরে—কে জানে হয়তো ঐ সুতনুকা-দেবদিস্নের বংশেই—জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাদ্রাজ রাজ্যে ডক্টর মিসেস মুখলক্ষ্মী রেড্ডি। বলতে গেলে যাঁর একক প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালে ভারত সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছিল দেবদাসী প্রথা।

কিন্তু সে সব কথা এখন নয়। অনেক পরে। আমরা এখনও আছি গুপ্তযুগে। তাই আজ আমি শুধু শোনাব সেই বিশেষ দিনটির কথা। মহাভিক্ষু ফা-হিয়েন আর কবি কালিদাসের স্মৃতিবিজ্ঞড়িত সেই প্রত্যুষের কথা।

ফা-হিয়েনের অর্ণবপোত গঙ্গার বাঁকে বিলীন হয়ে গেলে কবি গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। হস্তপদ প্রক্ষালন করে তাঁর চিহ্নিত অজিনাসনে বসলেন। মসীপাত্র, লেখনী, ভূর্জপত্র সাজিয়ে নিলেন।

এতক্ষণে তিনি বৃষ্টিচকরাশির সেই জিজ্ঞাসার উত্তরটা খুঁজে পেয়েছেন। একটি প্রশ্নের ভিতর দিয়ে। সুতনুকার সেই আকুল অসতর্ক স্বগতোক্তি থেকে—

‘আপনি ঠিক জানেন?’

না! কবি ঠিক জানেন না। স্বীকার করতে তিনি বাধ্য—গঙ্গাবক্ষে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে গান্ধর্ব বিবাহেই ঐ মিলনাস্তক কাহিনীর যবনিকাপাত ঘটেনি। নৌকা চলেছে পূর্বাভিমুখে, কিন্তু সহস্রাঙ্ক এবং নগরকোটালের তন্নাশীবাহিনীও দ্রুতগতি অশ্বপৃষ্ঠে চলেছে নদীর কিনারা দিয়ে। অর্ণবপোত একদিন উপনীত হবে তাম্রলিপ্তি বন্দরে—সেই যেখানে নদী বিলীন হবে সাগরে। সার্থক হবে মহাসঙ্গমে।

কিন্তু সুতনুকা কি বিলীন হতে পারবে আর এক মহাসঙ্গমে?

তারকাসুর যে এখনও পদাঘাতে প্রকম্পিত করছে পৃথিবীকে!

‘কুস্মার’ অজাত!

শুধু ‘ইচ্ছে হয়ে’ লুকায়িত আছে সুতনুকার মাতৃহৃদয়ে।

না! স্বীকার্য : কাব্য এখনও শেষ হয়নি!

ক্রমে তাঁর মুখ স্বপ্রাচ্ছন্ন হল। মনে মনে বললেন, হে জগৎপিতা, হে জগন্মাতা! তোমরা এ অধম সন্তানের ধৃষ্টতা মার্জনা কর।

যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়ে কবি লেখনী উদ্যত করলেন :

॥ অষ্টম সর্গ : ॥

“পাগিপীড়ণবিধেরনস্তরং শৈলরাজদুহির্ভূহরং প্রতি—” 13



সূতনুকা নয়, এবার দেবদ্বিমর কথা কিছু আলোচনা করা যাক।

মানুষ নারীজাতিকে প্রথম চেনে মায়ের রূপে। দেশকাল নিরপেক্ষভাবে প্রথম জ্ঞানোদয় হতেই সে দেখতে পায় স্তনদায়িনী জননীকে। তার ক্ষুদ্রজীবন জননীকেন্দ্রিক। সে আর কিছু চেনে না। ক্রমে তার বয়স বাড়ে। দেহে মনে। তার দেহে পরিবর্তন আসে ; সে লক্ষ্য করে সমবয়সী মেয়েদের দেহেও ঘটতে থাকে অনুরূপ রূপান্তর। একদিন তার দৃষ্টির বদল হয়, নারীকে জননী নয়—জায়া রূপে দেখতে শেষে। ‘ম্যাডোনা’ বদপাশ্চরিত হয় ‘ভেনাস’-এ।

বিশ্বভাস্করের ক্ষেত্রেও ঘটেছে অনুরূপ বিবর্তন।

বিশ্বশিল্পচেনার উষাযুগে—প্রাগৈতিহাসিক কালে—নারীকে শিল্পী প্রথম দেখেছে মায়ের রূপে। মাতৃদেবর দিকটাই সে আমলে সে ফুটিয়ে তুলেছে। তারপর যেহেতু সে শিল্পী, তাই মাতৃদেব সন্তাকে সে আরোপ করেছে অন্যান্য দিকে—যা কিছু তার মায়ের মতো। জননী দেন স্তন্যসুধা, ধরিত্রী দেন শস্য ; ফলে ধরিত্রীদেবীতে সে মাতৃদেব আরোপ করল। গাভী জননীর বিকল্প—তাই তাকে গোমাতারূপে চিত্রিত করল হিবু। এই যে বিবর্তন—‘ম্যাডোনা’র ধারণা থেকে ‘ভেনাস’-এর পরিকল্পনা—এটা অনুধাবন করতে মানবসভ্যতার প্রথম পর্যায় থেকে খানকয়েক চিত্র পেশ করা যাক।

প্রাচীনতম চিত্রটির নাম ‘ভেনাস্ অব উইলেনডর্ফ’। বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রথমে তার একটি রেখাচিত্র দেবার চেষ্টা করেছি। চূনাপাথরের তৈরী এই ছোট্ট মূর্তিটি (১০ সেমি.উঁচু) বর্তমান অস্ট্রিয়া অঞ্চলের জনৈক অজ্ঞাতনামা ভাস্কর রূপায়িত করেছিল, অনুমানিক ত্রিশ হাজার বছর আগে। অর্থাৎ মানুষ নামক জন্তু যখন শিকার এবং ফলমূল আহরণ ছেড়ে চাষবাসে সবে মন দিচ্ছে, গৃহপালিত পশুর সাহায্যে জীবনযাত্রা সরল করছে। নামে যদিচ ‘ভেনাস’, নারীমূর্তিটি নিঃসন্দেহে আসন্ন জননীর। ‘অ্যানান্সেশন’-এর।

দ্বিতীয় উদাহরণটিও প্রাচীন প্রস্তর যুগের—প্রায় বিশ হাজার বছরের পুরাতন। দেবদাসী ৫৪

এক্ষেত্রে ‘স্বেকনম্বা স্তন’ ও গুরুনিতম্বে মাতৃদেবের ব্যঞ্জন। এই জাতীয় মাতৃমূর্তি বর্তমান যুগের ভাস্কর্য বানায়। প্রথম দুটি উদাহরণে মুখমণ্ডলে বাস্তবানুগ রূপারোপের কোন প্রচেষ্টা করা হয়নি। মাতৃত্বতাবের জন্য বোধ করি তা ছিল নিষ্প্রয়োজন।

এবার তৃতীয় উদাহরণটি (পৃষ্ঠা-২৪) লক্ষ্য করুন। এটি প্রায় বিশ হাজার বৎসর পূর্বকাল। এবারে শিল্পী নারীমূর্তির সর্বাংগই খোদাই করেননি, করেছেন শুধু মুখখানি। এ মূর্তি ‘মাদেনার’ নয় ‘ভেনাস’-এর। শুধু তাই নয়, পণ্ডিতেরা^১ বলেন, এইটিই পৃথিবীর আদিমতম ‘পোট্রেচার’-বাস্তব নারীমূর্তির অনুকরণের প্রচেষ্টা: প্রতিকৃতি! আরও লক্ষণীয়—প্রথম মূর্তিটি ছিল চূনাপাথরের, দ্বিতীয়টি পোড়ামাটির, কিন্তু এটি হচ্ছে হাতির দাঁতের। অধরোষ্ঠ খোদাই করা হয়নি, কিন্তু চোখ নাক, ডেউখেলানো চুল এবং দীর্ঘায়ত গ্রীবা (আপনার কি রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত লাভণ্যের গ্রীবার কথা মনে পড়ছে? আমার কিন্তু মনে পড়ছে কোরাজ্জিওর—‘ম্যাডোনা অব দ্য লঙ্গ-নেক’) অষ্টাদশী তরুণীকে অপূর্ব সুখমামণ্ডিত করেছে। বিশ্বের শিল্প ইতিহাসে দেবদ্বন্দ্ব এই প্রথম সূতনুকার সম্মান পেল।

চতুর্থ উদাহরণে আমরা অনেক অনেক বছর এগিয়ে এসেছি। মাত্র তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের এ নারীমূর্তিটি খোদাই করেছেন নীল নদের অববাহিকার কোনও মিশরীয় ভাস্কর। এটি ‘ভেনাস’ নয় ‘মাদেনার’। শিল্পী সেখানে স্ত্রীমূর্তির নাতিমূলের নিচে অনেকগুলি ছিদ্র করে বলতে চেয়েছেন—মহিলাটি বহুবার গর্ভধারণ করেছেন।

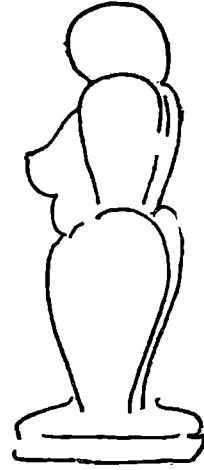
মেসপোটোমিয়ায় প্রাপ্ত (আঃ ২০০০ খ্রীঃ-পূঃ) পরবর্তী এই রমণী-মূর্তি জন্মী ও নরমসহচরীর মাঝামাঝি। বোধ করি এর জন্মদেবীর চেয়ে নারী সৌন্দর্যটাই বেশি প্রকট। তাই —চোখ-নাক-মুখ সব কিছুই খোদাই করা হয়েছে।

সিরিয়া থেকে সংগৃহীত উদাহরণে (আঃ ১৫০০খ্রীঃ পূঃ) দেখছি শিল্পী মাতৃদেবের অনুভাবনাটির সঙ্গে মাতা ধরিত্রীকে একাক্ষ করেছেন। মাতৃদেবী এতদিনে একটি পরিষেয় বস্ত্রে সুশোভিতা; তাঁর কণ্ঠে ও কপালে রত্নহার; এবং তাঁর দুই হাতে শস্য।

ভারতবর্ষীয় শিল্পীর ক্ষেত্রেও নারীসম্ভার সম্বন্ধে ধারণাটি একই পথে বিবর্তিত হয়েছে। মোহেন-জো-দাড়ো ও হড়প্পায় প্রাপ্ত আদিম পুরুষ ও স্ত্রীর মূর্তি নির্মিত হত প্রতীকচিহ্নরূপে, যথাক্রমে লিঙ্গপ্রতীকী দণ্ড এবং আংটির মতো ছিদ্র-সমবিত স্ত্রীপ্রতীকী। অচিরেই ভারতীয় ভাস্কর জন্মী ও রমণীর একটি সমন্বয় করতে চাইল। কোথাও এর পাল্লা ভারী, কোথাও ওঁর। মোহেন-জো-দাড়োর বিখ্যাত ব্রোঞ্জের নারীমূর্তিতে জন্মদেবী প্রায় অনুপস্থিত। অলঙ্কার তারাক্রান্ত এ নর্তকী শুধু কামনার ধন। অপরপক্ষে বিহার প্রদেশের চম্পারণ জেলায় ‘লাউড়িরা’ গ্রামে প্রাপ্ত নারী মূর্তিটি জন্মদেবীর প্রতীক। নারীদেবীর এই দ্বি-ধারা গঙ্গা যমুনার মতো সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে আর্ষাবর্তে।



নীলনদ অববাহিকায় প্রাপ্ত এ মাতৃমূর্তিটি
তিন হাজার খ্রীঃ-পূর্বাব্দের। মিশরীয় ভাস্কর
মাতৃজ্ঞেই হিম দেখিয়ে বলতে চান— জননী
বহুবায় গর্ভ ধারণ করেছেন।

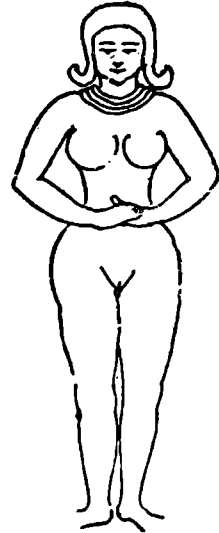


প্রায় বিশ হাজার বছর পূর্বেরকার এ জননী
মূর্তিতে মুখচোখ গড়া হয়নি। স্তোমকনন শুন ও
ওরু নিভে মাতৃজ্ঞের স্বপ্ননা। এটি পোড়া মাটির
ভাস্কর্য।



সিরিয়ায় প্রাপ্ত (আঃ ১৫০০ খ্রীঃ-পূঃ) এই
জননীমূর্তি ধর্ম্মীদেবীর সঙ্গে একাক্ষ হয়ে গেছেন।
তিনি সালকারা, সবজা এবং শস্যদায়িনী। লক্ষণীয়
এই প্রথম আমরা 'প্রোফাইল' পেলাম, আমাদের
আলোচ্য উদাহরণগুলিতে।

দেবদাসী ৫৬



মোসোপটেমিয়ার প্রাপ্ত (আঃ ২০০০ খ্রীঃ-পূঃ)
এ মূর্তিতে নাকমুখ, চোখ ও অলঙ্কার দেখতে পাচ্ছি।
'মাদোনা' থেকে 'ভেনাস'—এ উত্তরণে এ একটি
সোপান।

pathagat.net

দেবদাসী প্রসঙ্গে ইদনীংকালে যা কিছু লেখা হয়েছে—অর্থাৎ আমার সীমিতজ্ঞানে বাঙলা ইংরাজীতে যে কয়খানি বই পড়েছি, সকলেই এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার। বাস্তবিকপক্ষে ইংরেজ অধিকারের পরবর্তী যুগে এ প্রথা যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাতে নিন্দা ছাড়া আর কিছু করারও ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগে যে ব্যবস্থাটি ছিল তা কি শুধুই অন্ধকারাচ্ছন্ন? রূপালীরেখা কি কোথাও নজরে পড়ে না? তদনীন্তন সমাজব্যবস্থায় স্ত্রীলোকদের স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র জীবনধারণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, অভিভাবকহীনা পূর্ণযৌবনা নারী অনেক সময় স্বেচ্ছায় এসে আশ্রয়ভিক্ষা করত মন্দিরে। কখনও বা অতি দীন পরিবারের অভিভাবক কন্যাকে পাত্রস্থ করা অসম্ভব বিবেচনা করে মেয়েটিকে মন্দিরে উৎসর্গ করে আসতেন। উভয় ক্ষেত্রেই দেবতার আশ্রয় না পেলে ঐ মেয়েদের পতিতালয় ভিন্ন যাবার কোনও পথ ছিল না। নিঃসন্দেহে পতিতালয়ের অপেক্ষা মন্দির কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে জীবনধারণই অনেক বেশী কাম্য; এমনকি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সীমিত পরিবেশে মেয়েটি দেহদানে বাধ্য হলেও। এই সব বস্তুতাত্ত্বিক দিক নিয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। এখন আর একটি তাত্ত্বিক দিকের কথা বলি :

রবীন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে একবার দিলীপকুমারকে বলেছিলেন,² “এখনকার কালের পণ্যস্ট্রীদের আদর্শে তখনকার কালের মোহিনীদের বিচার করা ভুল। তারা যে দেহতৃষ্ণা নিবারণের জন্যই তা নয়, তারা চিন্ততৃষ্ণা নিবারণের জন্য। কাপুরুষের কাছেই স্ত্রীলোকেরা লালসার সামগ্রী, বীরের কাছে নয়। কাপুরুষ নিজের হীন প্রয়োজনেই স্ত্রীলোককে হীন করে ফেলে। যেখানে সেই প্রয়োজনের দাবীই একান্ত নয়, সেখানে পুরুষের পৌরুষেই নারীমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে। মুচ্ছকটিকের বসন্তসেনার কথা চিন্তা করে দেখলেই একথা স্পষ্ট হবে। চারুদত্তের মতো শ্রদ্ধার যোগ্য গৃহস্থ-পুরুষের পক্ষে বসন্তসেনার সঙ্গ যে হয় এমনতর বিচারের আভাসমাত্র এই নাটকে কোথাও নেই। শুধু তাই নয়, বসন্তসেনার যে চরিত্র বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব নেই বটে কিন্তু রমণীর দায়িত্ব আছে।”

রমণীর দায়িত্ব দু-জাতের— জৈবিক, পারিবারিক ও মাতৃত্বের এবং মানসিক, হৃদয়, অনুপ্রেরণার। বিধাতার বিচিত্র খেলালে ঐ দুজাতের দায়িত্ব নেবার অধিকার সকল স্ত্রীলোকের থাকে না। কেন থাকে না, এই প্রশ্নটাই অবৈধ। বিশ্বশিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস আমাদের সেকথাই বলছে।

ম্যাডোনা আর ভেনাস, লক্ষ্মী আর উর্বশী কচিত মিলিত হন। মেরী-পীয়ের অথবা আইরিন-জোলিও কুরী ইতিহাসে দুর্লভব্যতিক্রম—কোটিকে যুগল। জ্ঞাপ্তিসীর তাড়নায় ক্ষতবিক্ষত সক্রোশি আবার ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা—কোটিকে শুটিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে

কবি, শিল্পী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং তাঁদের সম্ভানের জননীকুল এই সত্যটাকে মনে না নিলেও মেনে নিয়েছেন। অনিবার্য নিয়তির নির্দেশ হিসাবে—জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর মতো। যদি ‘ঝরনাতলার উছল পাত্রটি’ হয় পরস্তী, তখন ‘ঘরের কোণে ভরা পাত্র’ নীরব থাকলেও সামাজিক কেলেঙ্কারী চরম হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে ঐ তৃতীয় ব্যক্তি বা দ্বিতীয়া রমণী যদি হন গ্রীসের হেটেরা, প্রাচীন ভারতের জনপদকল্যাণী, জাপানের গেইসা, ঊনবিংশতকের পারী নগরীর *dermi-mondaine* অথবা আধুনিককালের অলোকপ্রাপ্তা উইমেল লিব-এর ক্ষমজাধারিণী ‘মড’, তাহলে প্রতিবেশিনীর খরজিহা খরতর হবার দিকে ঝোঁকে না।

শিল্পী বা প্রতিভাবানের কিন্তু সেদিকে কোন দৃষ্টিপথ নেই। তার প্রতিভা বিকাশের রুদ্ধতার খুলে দেবার উপযুক্ত কৃষ্ণিকাটির সন্ধান পাওয়া মাত্র সে দুর্নিবার বেগে সেদিকে ছুটে যায়। ইদানীং ডিভোর্সের সুযোগ এসেছে, এতদিন হতভাগিনী স্ত্রী শান্তমনে এ দুর্ঘটনাকে মেনে নেবার চেষ্টা করত।

সেনেটের পেরিক্লিস্ থেকে পল গগ্যা—এবং তাঁর আগে ও পরে একই ইতিহাস। এথেন্সের মহাপ্রতিভাধর রাজনীতিবিদ পেরিক্লিস্—যিনি বিশ্বস্থাপত্যকে উপহার দিয়েছেন পার্থেনন—তিনি সাক্ষী স্ত্রীকে ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছিলেন তদনীন্তন গ্রীসের শ্রেষ্ঠা ‘হেটেরা’ অ্যাস্পেশিয়ার কুঞ্জে। গগ্যা তাঁর শিক্ষিতা স্ত্রীকে বর্জন করে চলে গেলেন সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতি দ্বীপে—আশ্রয় নিলেন এক অনার্যার বাহুবন্ধে। নানান দেশের, নানান কালের একই ঘটনার পুনরুৎপত্তি নিম্নয়োজন।

হয়তো ছেলেমানুষি হচ্ছে, তবু যে মালোপমাটা মগজে এল সেটাও পেশ করি :

মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা সমাজটাকে সাজাতে চেয়েছিলেন আধুনিককালের ফুটবল খেলার আইনে। স্ত্রী হচ্ছেন গোলকীপার। একই গোলের দুই স্তরের মাঝখানে তার অবস্থান—বড়জোর লক্ষ্মণের খড়ির গম্ভী দেওয়া পেনাল্টি সীমানার মধ্যে তাঁর সীমিত নড়াচড়া। এক প্রান্তে সদর, অপর প্রান্তে খিড়কি। কিন্তু ঐ খিড়ির গম্ভী দেওয়া সীমিত ভূখণ্ডে তিনি স্বরাজ্যের নিরঙ্কুশ সম্রাজ্ঞী। আকিঞ্চনের যে অকিঞ্চনটি নিয়ে এত মারামারি, হানাহানি—যাকে সবাই মিলে কখনও তুলছে মাথায়, কখনও করছে পদাঘাত—একমাত্র তিনিই সেটাকে দুই হাতে কোলে তুলে নিতে পারেন। এ অধিকার আর কারও নেই। তবু ঐ যে অগণিত দর্শকদল ওরা কিন্তু বাস্তবে সে দৃশ্যটা দেখবার জন্য সমবেত হয়নি। গোলকীপার সদ্যোজাত শিশুর মতো ঐ অকিঞ্চনটিকে কোলে তুলে নিলে তারা প্রশংসা করছে বটে—কিন্তু ওরা বাস্তবে এসেছে ভেনাসের সন্ধানে, ম্যাডেনার নয়। ভেনাসের দল আছে সামনের সারির ফরোয়ার্ড লাইনে। খিড়কি-সদর থেকে অনেক অনেক দূরে। ওরা ঐ অকিঞ্চনকে দুই হাতে বুকে তুলে নেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত—তা হোক। দর্শকদলের নজর ওদের দিকেই। ওরা নানান ছলচাতুরী দেবদাসী ৫৮

জানে। ডাইনে বাঁয়ে পাশ কাটিয়ে, ঢুকে পড়ে পরের ঘরে। মোহিনীমায়ায় জাল বিস্তার করে শেষমেশ ঐ জড়বস্তুটাকে ঠেলে দেয় পরের ঘরে।

আর সমস্ত গ্যালারি তখন সমস্বরে ভেঙে পড়ে উল্লাসে—গো—ল।

Goal ! সেটাই লক্ষ্য! দুর্ভাগ্য, সেটা ঘরের কোণে ভরা পাত্রে থাকে না। থাকে ঝরনা-তলার উছল পাত্রে। পরের ঘরে।

এটাই নাকি খেলার আইন।

* * * * *

একটা কৈফিয়ৎ বাকি আছে। ইতিপূর্বে বলেছি, আমার ধারণা—তৃতীয় খ্রীস্ট-পূর্বাব্দের সেই যোগীমারা গুহার অজ্ঞাত দেবদ্বন্দ্বি চিত্রশিল্পী ছিল না, নৃত্যশিল্পী ছিল না, ছিল ভাস্কর। একথা কেন বলছি?

তার হেতু ললিতকলার যাবতীয় বিভাগের ভিতর ভাস্কর্যই হচ্ছে সবচেয়ে পৌরুষব্যঞ্জক। সেই শিল্পটি ত্রিমাত্রিক বাস্তবের বড় কাছাকাছি, এবং সেই শিল্পের মাধ্যমে সৌন্দর্য-সরস্বতীকে লাভ করতে হয় পেশী সঞ্চালনে—কঠোর কসরৎ, অঙ্গুলিহেলনে বা ভ্রুভঙ্গিতে নয়। সে দেবীর পূজার গঙ্গোদক শ্রমজল! যুরোপের উচ্চ-রেনেসাঁর দুই দিকপালকে তুলনামূলক বিচারে তৌল করে দেখতে পারেন : লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি এবং মিকেলান্জেলো বুয়োনারোভি। দুজনেই চিরকুমার। লেঅনার্দো, খাঁর শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি তুলির টানে, তিনি কোনও ‘হুাদিনী’ শক্তির সন্ধান করেছেন বলে জানি না। না, মোনালিসা নয়, ঐ রমণীর প্রতিকৃতি বিশ্বললিতকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও নিঃসংশয়ে বলা যায়—লিঙ্গ কোন অর্থেই ছিলেন না লেঅনার্দোর প্রেরণার উৎস। উভয়ের মধ্যে বিশেষ অর্থে ‘প্রেম’ও সঞ্চারিত হয়নি। অপরপক্ষে চিরকুমার মিকেলান্জেলো রমণীর দুই রূপই দেবেছেন—উর্বশী ও লক্ষ্মী। দেহজ ও দেহাতীত প্রেম। আর্টিন স্টোনের রচিত “The Agony and Ecstasy” গ্রন্থে একাধিক স্থলে যে বর্ণনা আছে তার ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। বনি থেকে তুলে আনা ষেত মর্মরটিকে মিকেলান্জেলো প্রথমে ধুয়ে-মুছে নিচ্ছেন, স্নান করাচ্ছেন, কখনও বা আবেগে তাকে চুষন করছেন, জড়িয়ে ধরছেন। তারপর দুই হাঁটুর মধ্যে সেই দুদ্ধত্ত মর্মরকে চেপে ধরে আঘাতের পর আঘাত করছেন।

যে হুাদিনী-শক্তি তাঁর প্রতিভাদীপে প্রথম আলোকস্পর্শ করিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন কন্টাসিনা, ‘Little Countess’ বা বাস্তলায় ‘ছোট রাজকুমারী’। ফ্লোরেন্সের নগরাধিপতি লরেঞ্জো দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট-এর কনিষ্ঠা আত্মজা। পনের বছর বয়সে মিকেলান্জেলো তাঁকে প্রথম যখন দেখেন তখন কন্টাসিনার বয়স মাত্র তের। ঐ লরেঞ্জোর শিল্পোদ্যানে, যেখানে মিকেলান্জেলো শিক্ষার্থী হিসাবে ইতিপূর্বে যোগদান করেছিলেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম—উভয়তই—‘কাফ্ লাভ’। ক্রমে সেই ছেলেমানুষি এক স্বর্গীয় প্রেমে রূপান্তরিত

দেবদাসী ৫৯

হয়েছিল। অথচ দুজনের কেউই অপরের কাছে সে-কথা স্বীকার করতে পারেননি।
স্টোনের^৩ বর্ণনার আক্ষরিক অনুবাদ শোনাই—মিকেলাঞ্জেলোর বয়স তখন সতেরো—

“রাজকন্যা এক পা এগিয়ে এল। ওদের ঠোঁটের মধ্যে তখন মাত্র দু আঙুলের ব্যবধান। রাজকন্যার পরিচায়িকা বুদ্ধিমতী—সে অন্য দিকে ফিরে দাঁড়ায়। কন্টাসিনা বলে, ‘প্যেরো (ওর দাদা) বলেছেন রিডোল্ফি পরিবারের (যেখানে তার বিবাহ স্থির হয়েছে) সকলে তোমার-আমার মেলামেশাটা ভাল চোখে দেখবে না। অন্তত বিয়েটা না চুকে যাওয়া পর্যন্ত।’

মিকেল জবাব দেয় না। তার অধরোষ্ঠ অগ্রসর হয় না। সে নিজেই যেন মর্মর মূর্তি। অথচ সেই মুহূর্তে মিকেলাঞ্জেলো মনে মনে ওকে আলিঙ্গন করে ধরেছে, ওর আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হয়েছে—কল্পনায় সে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছে ওর চুম্বনতৃষিত ওষ্ঠাধর।”

স্টোনের সাতশ পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থে মিকেল-কন্টাসিনার দৈহিক মিলনের এইটিই ঘনিষ্ঠতম বর্ণনা। দুজনের বারে বারে দেখা হয়েছে, শেষ দেখা কন্টাসিনার মৃত্যুশয্যায়—মেয়েটি তখন তিন সন্তানের জন্মী।

মিকেলাঞ্জেলো সারাটা জীবনে কোনদিন সাহস সঞ্চয় করে বলতে পারেনি সেই বিশেষ কথাটা। কন্টাসিনা পেরেছিল। সহজ ভাষায় নয়, তির্যক পন্থায়।

ঘন্টাটা ঘটে যখন মিকেলাঞ্জেলো ফিরে এল ‘বোলোনা’ থেকে। ততদিনে কন্টাসিনা তিন সন্তানের মা হয়েছে।^৪

—বোলোনা কেমন লাগল?

—দাস্তে-বর্ণিত নরক।

—সবটাই?

প্রশ্নটা সে সরলভাবেই পেশ করল। তবু তার চোখের কোণায় যেন আর কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। মিকেল হাত দিয়ে নিজের কপালের চুলটা সরাতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

—মেয়েটির নামটা কী?

—ক্লারিসা।

—তাকে ছেড়ে এলে কেন?

—আমি ছাড়িনি। সেই আমাকে ছেড়ে গেল।

—ও! যা হোক, এতদিনে তাহলে সে-ই কথাটার মানে অন্তত কিছুটা তুমি বুঝতে পেরেছ। যাকে ওরা বলে: ‘ভালবাসা’!

—‘কিছুটা’ কেন? পুরোমাত্রাতেই।

হঠাৎ থমকে গেল কন্টাসিনা। কি জানি কেন এ আনন্দসংবাদে চোখ দুটি বাষ্পাকুল দেবদাসী ৬০

হয়ে ওঠে, বলে, —আজ তোমাকে হিংসে হচ্ছে—

মিকেল প্রত্যুত্তরে কি যেন বলতে গেল; কিন্তু তার আগেই রাজকন্যা দ্রুতছন্দে মিলিয়ে গেল প্রাসাদের অন্তরমহলে।”

স্টোনের দীর্ঘ দুটি উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হলাম সেই কথাটারই উদাহরণ হিসাবে বোঝাতে যেটা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন দিলীপকুমারকে। কিন্তু দেহাতীত প্রেমের মহিমা বোধকরি ভাস্করের পক্ষে অতটা জোর দিয়ে প্রযোজ্য হতে পারে না। চণ্ডীদাস বলতে পারেন—‘কামগন্ধ নাহি তায়।’ পো বলতে পারেন :

“Thou wast all that to me, Love
For which my soul did pine—
A green isle in the sea of Love—
A fountain and a shrine,
All wreathed with fairy fruits and flowers
And all the flowers were mine.”

“আমার নিখিলে তুমি লীন ছিলে, প্রিয়া
আত্মা আমার তোমারেই শুধু চায়,
প্রাণময় দ্বীপ সাগরের নীলে, প্রিয়া,
তুলসীমঞ্চ আমারই এ আঙিনায়।
যে-ফুলে ও ফলে সেজেছ পরীর বেশে
সে-ফুল যে ফোটে অধর্মেরই বাগিচায়।”

কিন্তু ছেনি-হাতুড়ি-সম্বল মিকেলের শিল্পস্ফুরণের জন্য কন্টাসিনার পরেও প্রয়োজন হয় ক্লারিসার। আর্ভিন স্টোনের একটি বর্ণনা শোনাই^১—

মিকেলোঞ্জেলো কিভাবে পাথর খোদাই করছেন...“Now he dug into the mass, entered in the Biblical sense. In this act of creation there was needed the thrust, the penetration, the beating and pulsating upward to a mighty climax, the total possession. It was not merely an act of love, it was the act of love : the mating of his own inner patterns to the inherent forms of the marble, an insemination in which he planted the seed, created the living work of art.” (তারপর সে তোরণদ্বার অতিক্রম করল, সৃষ্টিতত্ত্বের মৌল নির্দেশে প্রবিষ্ট হল। সৃষ্টির জন্য এই চাপ অনিবার্য,—প্রবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন, বারে বারে, যতক্ষণ না মিলনের তুরীয় অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। এ মিলন নয়, মৈথুন—মর্মরের গর্ভে নিজের প্রতিভা-বীজটি বপন করা, যা সৃষ্টির মহিমায় জীবন পেয়ে হয়ে উঠবে—শিল্পসৃষ্টি।) ভাস্কর্যের ইতিহাসে আদিম-কাল থেকে এইভাবেই ঘটেছে শিল্পসৃষ্টির প্রচেষ্টা।

খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের গ্রীসে প্র্যাক্সিটেলস্ ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। হারমিস্, কনিডিয়ান ভেনাস ইত্যাদি শিল্প এবং সম্ভবত 'ভেনাস ডি মিলো' তাঁরই সৃষ্টি। তিনি প্রেমে পড়েছিলেন পাইরীন-এর। তদানীন্তন এথেন্সের শ্রেষ্ঠ হেটেরা—জনপদকল্যাণী। ঐ অসামান্য সুন্দরীকে নিরাবরণ মডেল করে শিল্পী একাধিক ভেনাস-মূর্তি গড়েছেন। তার একটির পদতলে—যেভাবে খোদাই করা আছে যোগীমারা-গুহার স্বীকারোক্তি, ঠিক সেভাবেই শিল্পী স্বয়ং খোদাই করে গেছেন এই পংক্তিটি : “Praxiteles hath portrayed to perfection the passion (Eros), drawing his model from the depths of his own heart and dedicates Me to Phryne, as prize of Me.” (প্র্যাক্সিটেলস তাঁর নিজ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কামনার (দেহজ) অনিন্দিত ব্যঞ্জনটি এখানে মূর্ত করছেন, আর তাই আমাকে উৎসর্গ করে গেছেন পাইরীনের নামে—সেই তো আমার মূল্য।)

দু'হাজার বছর পরে সাম্প্রতিক কালের (১৮৪০-১৯১৭) শ্রেষ্ঠ ভাস্কর রৌদ্যার কথা বলি। ওঁর চেয়ে আটত্রিশ বছরের ছোট বিশ্ববন্দিত মার্কিন নৃত্যশিল্পী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন রৌদ্যার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের একটি ঘটনা। একটি গ্রীক-নৃত্য দর্শনান্তে স্বল্পবাস-পরিহিতা ইসাডোরা ডানকান (১৮৭৮-১৯২৭) রৌদ্যাকে ঐ ক্লাসিকাল নৃত্যের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন “হঠাৎ আমার মনে হল রৌদ্যা আমার কথা শুনছেন না। তাঁর অধরের নিম্নাংশ ঝুলে পড়েছে—তাঁর চোখে আগুনের হলুদ। তিনি যেন অন্যজগতের মানুষ। আমার কাছে তিনি এগিয়ে এলেন। নিঃশব্দে আমার আস্থচ্ বেশবাসের উপর দিয়েই সর্বাত্মক হাত বুলাতে থাকেন—কাঁধে, শুনে, হাতে, নিতম্বে, জনুদ্বয়ে এবং পায়ে। হঠাৎ আমাকে দুই হাতে পিষ্ট করতে চাইলেন—যেন আমি একটা কাদার তাল। তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে তখন উত্তাপ নির্গত হচ্ছে। আমার ইচ্ছা হল—সেই উত্তাপে মোমের মত গলে যেতে! কিন্তু আজন্মের সংস্কার আমাকে ইচ্ছাপূরণে বাধা দিল। আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলাম। দ্রুত হস্তে জামা-কাপড়গুলো টেনে নিয়ে বললাম, ‘আপনি চলে যান’।”^৬

আমাকে মার্জনা করবেন। আমার বিশ্বাস, ঐ দেবদাসী নামক কুপ্রথাটি যদি ভারতবর্ষে চালু না থাকত তাহলে এই ভারতভূখণ্ডের অযুত-নিযুত মন্দিরে ঐ অনিন্দ্যকান্তি রমণীমূর্তিগুলিকেও আমরা পেতাম না। ঐ নাগরদোলায় দোলায়িত ঘৃণ্য নরকের কীটগুলিই ছিল যুগে যুগে ভারতীয় ভাস্করদলের ‘স্টার অব বেথলহেম!’

বাইবেল বলেছেন, পূর্ব দেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীর দল জেরুজালেম তীর্থে পথ চিনে-চিনে আসতে পেরেছিলেন ঐ তারার আলোয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতীয় ভাস্করদল নিজ নিজ বেথলহেম-তারকার আলোয় পথ চিনে চিনে ললিতকলালক্ষ্মীর প্রসাদলাভ করেছেন।



একটা উদাহরণ দিই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। ঘটনাটা আমি অবশ্য ইতিপূর্বেও বলেছি।

প্রায় দশ বারো বছর আগেকার কথা। ‘কলিঙ্গের দেব-দেউল’ নিয়ে কিছু গবেষণা-মূলক কাজ করব বলে উড়িষ্যা পরিক্রমা করছি। কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ মন্দির কোণার্কে আছি দিন সাতেক। প্রতিদিনই মন্দিরে যাই, স্কেচ করি। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরে দেখেছি পীড়দেউল—অর্থাৎ জগমোহনে ছিল দুই পোতাল। কোণার্ক সেটা তিন পোতাল বা তিন ধাপে গড়া। নিচে থেকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পোতালে পীড় বা ‘ফিন’-এর সংখ্যা যথাক্রমে ছয়, ছয় এবং

পাঁচ। এই তিন পোতালের পরিকল্পনা কলিঙ্গে আর কোনও মন্দিরে আমার নজরে পড়েনি।

প্রথম পোতালের চাতালে চারিদিকে চারটি করে সর্বসমেত ষোলটি দেবদাসীর মূর্তি। এ-ছাড়া রাহা-পাগ অংশের ঝুঁকে-থাকা অংশে চার দুকুনে আটটি নৃত্যরত মহাকাল বা ভৈরব মূর্তি। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পোতালের চাতালে ষোলটি নৃত্য-ব্যাক্তরতা কন্যামূর্তি আছে। সেখানে ভৈরব মূর্তি নেই। সর্বোচ্চ তৃতীয় পোতাল দর্শকের দৃষ্টিপথে সব চেয়ে দূরে। সেখানে কোন মূর্তি নেই।

কোণার্ক-জগমোহনের এই ষোলটি নায়িকা-মূর্তিভারতীয় ভাস্কর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বেশ মনে হয়, মূর্তিগুলি একই ভাস্করের হাতে গড়া। তাদের শৈলী এবং ‘প্রমাণ’ বা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আনুপাতিক হার সমান। প্রথম পোতালের চাতাল পর্যন্ত ওঠার সিঁড়ি আছে, অন্তত সত্তরের দশকেও যাত্রীদের অতখানি পর্যন্ত যাবার অনুমতি ছিল। তার উপরেও ওঠা যেত; কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিষেধ। প্রথম পোতালের উপর উঠে আমি স্কেচগুলি আঁকতাম। সেখানে উঠলে মনে হয় মূর্তিগুলি কিছু স্থলকায়া। প্রমাণ মানুষের চেয়ে উচ্চতায় বেশী। শিল্পশাস্ত্র বলছেন, নারীমূর্তিগুলি হবে সপ্ততাল—কিন্তু সে নির্দেশ এক্ষেত্রে ভাস্কর মেনে চলেননি। তিনি জানতেন, এই বিশেষক্ষেত্রে দর্শক

ও ভাস্কর্য এক সমতলে থাকবে না। দর্শক সচরাচর নিচে থেকেই দেখবে। তাই তার তাল-মান এমনভাবে নির্ণয় করেছেন যাতে নিচে থেকে আদৌ মনে হয় না—ঐ মেয়েদের ‘ডায়েট’ করা দরকার।

কন্যামূর্তিগুলি নিঃসন্দেহে দেবদাসীদের। তারা নৃত্যরতা—তাদের হাতে নানান বাদ্যযন্ত্র—টোলক, মৃদঙ্গ, বীণা, বাঁশী, খঞ্জনী, করতাল, ঝাঝর ইত্যাদি। অঙ্গে তাদের নানান জাতের আভরণ—কঙ্কন, কেয়ূর, শতনরী, কর্ণাভরণ, মুকুট প্রভৃতি। তাদের চুলবাঁধার কায়দাতেও কত বৈচিত্র্য।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই পীনোদ্ধত যুবতীবৃন্দের অপরূপ দেহসৌষ্ঠব অথবা বেশভূষাই শুধু নয়, ভাবব্যঞ্জনাতেও প্রতিটি মূর্তি আর সকলের থেকে পৃথক। ধরা যাক প্রথম পোতালের পূর্বমুখী নায়িকাটিকে। ফুঁ দিতে গিয়ে ওর গালটা একটু ফুলেছে। অল্পবয়স, মনে হয় পঞ্চদশী। এখনও যেন কিশোরী। ও-যেন দুনিয়াদারীর অনেক কিছুই বোঝে না— তাই এখানে সূত্নুকার হাসিটি অমলিন।



কোনার্ক জগমোহনের প্রথম পোতালের
পূর্বমুখী : বেণুবাদিনী।



কোনার্ক জগমোহনের প্রথম পোতালের
দক্ষিণপ্রান্ত বাসিনী : করতালবাদিনী

এবার ঠিক উপরের ধাপে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পোতালের পূর্বমুখী মেয়েটিকে দেখুন।

সে মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে পোতালের দক্ষিণতম প্রান্তে। এখানে সূতনুকা পঞ্চদশী নয়—সে পূর্ণযৌবনা। ভাদ্রের ভরা গাঙের মতো তার যৌবন 'টলমল-টলমল'! কিন্তু কি জানি কেন মনে হল ও বিষাদখিন্ন—সহস্রাক্ষের আদেশ অনুসারে কর্তব্যকর্ম করে যাচ্ছে বটে, কিন্তু মনে মনে সে কিছু একটা ভাবছে। কী ভাবছে? যে দেবদ্বন্দ্বের সমুখে ওকে এই বক্ষিমঠামে দাঁড়াতে হয়েছে তার থেকে দূরত্বের কথাটাই? কাছে গিয়ে আর একবার স্কেচ করলুম অপর দিক থেকে—তবু ওর মনের নাগাল পেলুম না।

এবার দেখুন প্রথম পোতালের দক্ষিণতম প্রান্তবাসিনী পূর্বমুখী করতালবাদিনীকে। মনে হয়—এও কিশোরী নয়, মধ্য-যৌবনা; যদিও হয়তো পূর্বোক্ত দেবদাসীর চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। দেবদাসী জীবনের যেন একপিঠই সে দেখেছে—চন্দ্রাননী জানে না—চন্দ্রের বিপরীত দিকে শাস্তকালের নীরন্ধ্র অন্ধকার! কোটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে যৌবনোত্তর বারনারীদের যে মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিলেন সে আইন আর মানে না কোনও রাজা! কিন্তু সেই অনাগত জীবনের ছায়াপাত ঘটেনি ওর ভঙ্গিমায়। তাই ওর অধরপ্রান্তে যৌবনোদ্ধাতার দার্দ্য। ওর হাসিতে মিশে আছে উপেক্ষা। শুধু হাসিতেই নয়, সমগ্র দেহাবয়বে। করতাল হাতে সে যেন বিশ্ববিজয়িনীর ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়েছে দেবদ্বন্দ্বের সমুখে।

এবার শেষ উদাহরণ। যার স্কেচ এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই দিয়েছি। বস্তুত যার কথা বলব বলে পাশাপাশি কয়েকটি নায়িকা মূর্তির চালচিত্র রচনা করছি। এটি আছে দ্বিতীয় পোতালে। উত্তর প্রান্তে! এ মূর্তিটি পশ্চিমমুখী। ওর দৃষ্টি অস্ত্রচালগামী সূর্যের দিকে। অপূর্ব এই মূর্তিটি। ওর অধরপ্রান্তে লেগে আছে ক্ষীণ একটা হাসির আভাস—কিন্তু সে হাসি যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে স্বতঃউৎসারিত নয়—যেন বাসিফুলের মালার হাসি! কেন-যেন মনে হয়—মেয়েটি খিন্ন, ক্লান্ত; আর সে শান্তি দৈহিক নয়, মানসিক, আত্মিক! দেবদাসী-জীবনের আবরণ ও আভরণে বৃষ্টি ওর মন ভরেনি, যেন কোন সুদূর পল্লীপ্রান্তের এক বাল্যবন্ধুর স্মৃতিতে ওর হাসিটি বিধুর। কিম্বা কি-জানি পশ্চিমমুখী বলেই এ মন্দিরের অধিদেবতার বিদায়গ্রহণে ও এমন বিষাদখিন্ন। কে জানে?



কোনকঙ্কামোহনের দ্বিতীয়
পোতালের পূর্বমুখী: ঢোলবাদিনী।

এই মূর্তিটির স্কেচ করার সময় একটা অদ্ভুত ইতিকথা সংগ্রহ করা গেছিল—যেটা

আপনাদের শোনাব এবার। উপকথাটি আমি সংগ্রহ করেছিলুম একজন বৃদ্ধ গাইড-এর কাছ থেকে। আমাকে ঐ মেয়েটির স্কেচ করতে দেখে সে ঘনিয়ে এসেছিল কৌতূহলী হয়ে। বস্তুত ক'দিন আগেই আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে। প্রভঞ্জনবেগে যে সব টুরিস্ট আসেন আর শালপাতা, চিনে বাদামের খোলা ছড়িয়ে রেখে ঝটিকাগতি প্রত্যাবর্তন করেন, আমি যে তাদের দলেনই, হয়তো এটুকু সমঝে নিয়েই সে আমাকে ভালোবেসেছিল। প্রখর মধ্যাহ্নে যখন যাত্রীদের ভিড় থাকত না তখন সে ঘনিয়ে এসে বসত আমার কাছে, ছায়ায়। আমার ফ্লাস্ক শূন্যগর্ভ হলে যেচে জল এনে দিত নিচে থেকে। কখনও বা গরম চা।

তার মুখেই শুনেছি, এই উপকথাটি। সে শুনেছিল অপর একজন স্বর্গত পেশাদারী গাইডের মুখে, অন্তত ত্রিশ বছর আগে। এই মুখে মুখে চলে-আসা কাহিনীর মূল কোথায় আজ আর তা জনবার উপায় নেই। কাহিনীর চরিত্রগুলির নামও সে বলেছিল, সে সব কথা ভুলে গেছি; কিন্তু তাতে অসুবিধা হবে না কিছু। নামগুলি তো আমরা জানিই।

বৃদ্ধ গাইডের মতে কোণার্ক-জগমোহনের তল-পোতালের ষোলটি দেবদাসীর মূর্তি একই হাতে গড়া বটে; কিন্তু উপর-পোতালে ষোলটি মূর্তি দ্বিতীয় আর এক শিল্পীর হাতের কাজ। আমি মানতে চাইনি। এ নিয়েই তর্ক। এবং সেই সূত্রেই উপকথাটির অবতারণা:

কোণার্ক-জগমোহনের তল-পোতালের ষোলটি দেবদাসীর মূর্তি যিনি গড়েছিলেন, ধরা যাক তাঁর নাম বিশ্বকর্মা মহাপাত্র। বিশ্বকর্মার সৃষ্ট মূর্তিগুলির অধিকাংশই মহাকালের ভুকুটি উপেক্ষা করে, লবণাক্ত সামুদ্রিক ঝড়ো হাওয়ায় অস্বীকার করে তাদের লাবণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজও। তাঁর সমতুল্য প্রতিভাবান ভাস্কর ছিল না সমকালের ভারত-ভূখণ্ডে। কিন্তু ভাস্করের ব্যক্তিগত জীবনটি ছিল অভিশপ্ত। বিশ্বকর্মা শিল্পী হওয়া ছাড়া আর কোনও অপরাধ তিনি করেননি—স্বাধিকার-প্রমত্ততার আর কোনও নজির নাই; তবু যৌবনের প্রথম পর্যায়েই তাঁকে প্রকৃতপক্ষে বন্দী করে আনা হয়েছিল অর্কক্ষেত্রে। জগমোহনের উচ্চ অলিন্দে দাঁড়িয়ে সূর্যসাক্ষী পুঙ্করমেয়ের উদ্দেশ্যে তিনি কুটি ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন কি না জানা নেই। কিন্তু প্রোষিতভর্তৃকা যৌবনবতী ভাস্করজায়ার সঙ্গে ইহজীবনে আর তাঁর পুনর্মিলন হয়নি। দ্বাদশবর্ষকাল এই অর্কক্ষেত্রেই প্রাণপাত পরিশ্রম করে অস্তিমে এখানেই প্রাণপাত করেছিলেন তিনি।

ভাস্কর বিশ্বকর্মা মুক্তি পেলেন। কিন্তু কলিঙ্গরাজ নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়ার তরফে নিযুক্ত এ মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্য-পুরোহিত সহস্রাক্ষ প্রমাদ গণলেন—তলা পোতালের মূর্তিগুলির সমতুল্য উপর-পোতালের মূর্তিগুলি বিশ্বকর্মা নির্মাণ করে দেবদাসী ৬৬

যাননি। দু-একজন বিশিষ্ট ভাস্করকে দিয়ে সে কাজ করানোর চেষ্টা হল—কিন্তু তাদের কাজ একটুও মনোমত হল না সহস্রাক্ষের। মহামাতা চতুর্দিকে সন্ধান করতে থাকেন, বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজ সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করার উপযুক্ত শিল্পী কি গোটা কলিঙ্গ রাজ্যে নেই? দূত ছুটল রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে।

শেষ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গেল। আছে। বিশ্বকর্মার হাতের কাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার মতো কারিগরও আছে স্বর্ণপ্রসূ কলিঙ্গ রাজ্যে। দূত স্বচক্ষে দেখে এসেছে তার হাতে-গড়া পাথরের মূর্তি। সে মূর্তি নাকি অপূর্ব। শিল্পতীর্থ কোণার্কোও নাকি অমন সুন্দর, অমন প্রাণবন্ত মূর্তি নাই।

জ্ঞা কুণ্ঠিত হল সহস্রাক্ষের। বললেন, কী বকছ উন্মাদের মতো?

হাত দুটি জোড় করে সংবাদবহ নিবেদন করে, স্বচক্ষে দেখে এসেছি প্রভু, না হলে এ ধৃষ্টতা প্রকাশ করতাম না।

—তবে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?

—সে অস্বীকার করল। বলল, তোমাদের রাজাও মন্দির গড়ছেন, আমিও মন্দির গড়ছি। আমার সময় নেই।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহামাতা। কে এই দুঃসাহসী ভাস্কর? কোন্ সাহসে সে প্রত্যাখ্যান করে রাজ্যদেশ? আত্মসংস্বরণ করে শুধু বললেন, মন্দির গড়ছে? নিজ ব্যয়ে? কোন্ দেবতার মন্দির?

—জানি না প্রভু। মন্দির এখনও শুরু হয়নি। সে গড়ছে একটি দেবমূর্তি। আমি সেই অসমাপ্ত মূর্তিটি দেখেছি প্রভু, কিন্তু কোন্ দেবতার মূর্তি তা বুঝতে পারিনি। পুরুষমূর্তি। দেবতার। শুনলাম, সে দিবারাত্র কাজ করে চলেছে। অশ্বমূর্তি সমাপ্ত হয়েছে। দেবমূর্তিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

—অশ্বারোহী দেবমূর্তি? হরিদম্ব?

দূত মাথা নেড়ে বলে, আজ্ঞে না প্রভু। হরিদম্ব তো অশ্বারোহী সূর্যমূর্তি। ইনি অশ্বারোহী নন, আছেন ভূতলে, অশ্বের বলগা চেপে ধরে তার গতি রুদ্ধ করেছেন।

দূরন্ত কৌতূহল হল সহস্রাক্ষের। শুধু কৌতূহল নয়, ক্রোধ। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট শিল্পশাস্ত্রসম্মত ভাবমূর্তি আছে। অশ্বারোহী মূর্তির পরিকল্পনা আছে সামান্যই। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ‘হরিদম্ব-সূর্য’ মূর্তি। বিশ্বকর্মা সে মূর্তি ইতিপূর্বে গড়েছে কালো কষ্টিপাথরে। মূল বিমানের উত্তর-পাশ্চদেবতা হিসাবে সে মূর্তিটি অধিষ্ঠিতও হয়েছে। তাহলে এই অর্বাচীন ভাস্কর কোন্ দেবতার মূর্তি গড়ছে? পদাতিক-অশ্বারোহীর কোনও পরিকল্পনা তো শিল্পশাস্ত্রে নাই! শুধু এজন্য—শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ অমান্য করার অপরাধেই তো লোকটার শিরচ্ছেদ করা চলে! কিন্তু না! মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে দেখতে হবে লোকটা বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজ

শেষ করতে পারে কি না।

সপার্বদ তখনই রওনা হয়ে পড়েন অশ্বপুষ্ঠে, কলিঙ্গের দূরতম পল্লীপ্রান্তে।

স্বচ্ছতোয়া করুণা নদীর একান্তে একটি বিমস্তু পল্লীগ্রাম একদিন মুখরিত হয়ে উঠল অশ্বক্ষুরঙ্কনিতে। রাজপ্রতিনিধি মহামাত্য সহস্রাঙ্ক নাকি স্বয়ং এসেছেন গ্রামে। দূতের সঙ্কেতে অশ্বারোহীর দল এসে থামে গোলপাতায় ছাওয়া একটি পর্ণকুটীরের সম্মুখে। বাহির হয়ে আসে নগ্নগাত্র এক তরুণ ভাস্কর। তার হাতে ছেনি-হাতুড়ি।

শ্যামাঙ্ক। পেশীবহুল সুগঠিত তনু, উন্নতনাসা, আয়তচক্ষুতে যেন অপার্থিব স্বপ্নলোকের আভাস। যেন কন্দর্প আবার এসেছেন বিশ্বকর্মার ভূমিকায় পুনরভিনয় করতে। কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে সে তাকায় আগন্তকের দিকে।

সহস্রাঙ্ক আত্মপরিচয় দেওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি তালপাতায় বোনা একটা চাটাই বিছিয়ে দেয় মেটে দাওয়ায়। মহামাত্য অবশ্য তাঁর মহামূল্য বসনে পল্লীপ্রান্তের ধূলার প্রলেপ লাগাতে অনিচ্ছুক; তাই গৃহদ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই প্রশ্ন করেন, তোমার নাম?

—দেবদিন্ন।

—তুমি নাকি পরম ভট্টারক শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীমান্ মহারাজ নরসিংদেব লাঙ্গুলিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি মন্দির গড়ছ?

দেবদিন্ন স্নান হেসে বলে, আজে না। ভুল শুনেছেন। আমি উন্মাদ নই। তাছাড়া কারও সঙ্গেই পাল্লা দেওয়ার বাসনা আমার নাই। আমি নিজ অভিরুচি অনুসারে একটি দেবমূর্তি গড়ছি মাত্র। মন্দির নির্মাণের আর্থিক সামর্থ্য আমার নেই।

—বটে! কোন্ দেবতার মূর্তি?

—ভাস্করের।

—অর্থাৎ সূর্যের?

—আজে না। তিনি স্বর্গের ভাস্কর নন, মর্তের ভাস্কর। সূর্য অপেক্ষাও তিনি গরীয়ান্!

অর্থ গ্রহণ হয় না সহস্রাঙ্কের। তবু অখ্যাত পল্লীগ্রামের এই অর্বাচীনের ঔদ্ধত্যে তাঁর দক্ষিণহস্ত অভ্যাসবশে চলে গিয়েছিল ভরবারির মুঠের দিকে। ব্রাহ্মণ হলেও রাজপ্রতিনিধি হিসাবে তিনি সর্বদাই সশস্ত্র। শেষে কোনক্রমে ক্রোধ সংবরণ করে বললেন, আমরা তোমার সেই মূর্তিটি একবার দেখতে পারি?

—এ তো আমার সৌভাগ্য। আসুন ভিতরে—

গৃহ-প্রাঙ্গণে রক্ষিত প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্তিটির দিকে দৃকপাত করেই চমকিত হন সহস্রাঙ্ক। বলেন, এ কি! দেবতা কোথায়? এ তো আমাদের প্রয়াত ভাস্করঃ বিশ্বকর্মা মহাপাত্র?

দেবদিন্ন সবিনয়ে বলে, আজে হ্যাঁ। তাঁরই মূর্তি। আমার কাছে তিনিই স্বর্গ, তিনিই ধর্ম, তিনিই আমার পরমংতপঃ!

—তুমি,.....তুমি আমাদের বিশ্বকর্মার পুত্র ?

—না হলে ও-কথা বলব কেন ?

দেবদিল্লের কোন ওজর আপত্তি শুনতে রাজী নন মহামাত্য। বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজ এই দেবদিল্ল ভিন্ন আর কেউ শেষ করতে পারবে না। কিন্তু তরুণ গিল্লীও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বললে, মায়ের সমস্ত অভিশপ্ত জীবনটা চোখের উপর দেখেছি। এ আদেশ আপনি করবেন না প্রভু। জননী আজ দৃষ্টিশক্তিহীনা—আমিই তাঁর অন্ধের যষ্টি। আর তা ছাড়া.....

সক্কেচে সে থেমে যায়।

কিন্তু রাজার প্রয়োজনের কাছে অন্ধ বৃদ্ধার চোখের জ্বলের কী মূল্য ?

অবশেষে দেবদিল্লের জননী স্বয়ং এসে জড়িয়ে ধরলেন পুরোহিতের চরণদুটি। দেবদিল্লের অসমাপ্ত বাক্য শেষ করে বললেন, পুত্রের বিবাহ স্থির করেছি। আগামী মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে আমার গৃহে আসছেন পুত্রবধু। এমন সময়ে এ কী সর্বনাশের কথা বলছেন, প্রভু ?

প্রধান পুরোহিত সহস্রাক্ষের হৃদয় কিন্তু পাষণ দিয়ে গড়া।

বধুও গ্রামের মেয়ে। নাম লক্ষ্মী। সতিই লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। লক্ষ্মীর সঙ্গে দেবদিল্লের শিশুকাল থেকেই জানাশোনা। খেলাঘরের বর-বউ হত ওরা। তারপর লক্ষ্মী বড় হয়েছে, এখন সে সক্কেচে তার বাল্যবন্ধুর সামনে বড় একটা আসে না। ওদের গভীর প্রণয়ের কথা গ্রামবাসী সকলেরই জানা আছে। আহা, দুটিতে ভারি সুন্দর মনায়। গাঁয়ের সবাই কাতর অনুনয় বিনয় করতে থাকে! শেষে লক্ষ্মীর বাবা এসে হাত দুটি জোড় করে বলেন, আপনি পুরোহিত, আপনিই বলুন—এক্ষেত্রে কী করণীয়। আমার কন্যার আশীর্বাদ হয়ে গেছে। এখন তো তার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! আপনি ওকে স্বচক্ষে দেখুন, আপনি কিছুতেই এমন লক্ষ্মী প্রতিমার এত বড় সর্বনাশ করতে পারবেন না।

ভিড়ের ভিতর থেকে কন্যাদায়গ্রস্ত অর্ধোন্মাদ টেনে নিয়ে আসেন ব্রীড়াকন্তা একটি নতমুখী বালিকাকে। সলজ্জে এগিয়ে এসে সে সহস্রাক্ষের পদধূলি গ্রহণ করে। তাকে দেখে বজ্রাহত হয়ে গেলেন প্রধান পুরোহিত। এমন পরমাসুন্দরী একটি নারীরদ্রু কেমন করে লুকিয়ে ছিল এই ছায়াঘন পল্লীপ্রান্তে! ধীরে ধীরে বলেন, তোমরা ঠিকই বলেছ। এমন সুঅনুকার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! আমি কথা দিচ্ছি, মহারাজের আশীর্বাদে এই পঞ্চদশীর সর্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে মুড়ে দেব আমি। কিন্তু তার পূর্বে দেবদিল্লকে এখনই যেতে হবে আমার সঙ্গে। মহারাজের দরবারে। সব কথা বলতে হবে তাঁকে।

দেবদিল্ল বলে, রত্নালঙ্কারে আমাদের প্রয়োজন নেই! এ মূর্তি অসমাপ্ত রেখে আমি কোথাও যাব না। আমি কারও বেতনভুকভূতা নই। রাজশক্তির এমন ক্ষমতা নেই....

তার মুখে চেপে ধরেন বিশ্বকর্মার বিধবা, অন্ধ বৃদ্ধা। কথাটা শেষ হয় না ; না

হোক, তার অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয় না কারও।

অন্তত সহস্রাঙ্কের।

অথচ আশ্চর্য, সহস্রাঙ্কের কোনও ভাববৈকল্য দেখা গেল না। তিনি যেন খেয়ালই করেননি ঐ অসমাপ্ত বাক্যের গুহ্যতা। নিতান্ত কৌতূহলী শিল্পশিক্ষার্থীর মতো প্রশ্ন করেন, এ মূর্তির বক্তব্য কি দেবদ্বন্দ্ব ? ও কেন অমন করে অশ্বের বলগা চেপে ধরেছে ?



তরুণ ভাস্কর স্নান হাসে। বলে, কেনার্ক মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত মহামাতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে মূর্তির ব্যঞ্জনা? বেশ তাই দিচ্ছি—আপনারা যে মন্দির গড়ছেন উত্তরকাল তাকে বলবে, নরসিংদেবের সূর্যমন্দির। তারা জানবে না, এ মন্দিরের প্রধান ভাস্করের নাম। তারা চিনবে না বিশ্বকর্মা মহাপাত্রকে। আমার এই মূর্তি তাই সেই ভাবীকালকে ডেকে বলবে—তোমরা শোন! কোনার্ক তীর্থে নভচারী মার্ত্তণ্ডদেবের রথাস্থের বলগা একদিন চেপে ধরেছিলেন বিশ্বকর্মা মহাপাত্র। অরুণচালিত স্বর্গীয় রথাস্থ সৃষ্টির আদিকাল থেকে মহাপ্রলয়ের শেষ দিন পর্যন্ত মহাকাশে ধাবমান থাকবে, নিত্য গতিশীল—কিন্তু মর্ত্যে? এই কোপার্ক-ক্ষেত্রে মানুষের হাতে সেই অশ্ব গতিহীন। চত্রবেতিমস্ত্রে দীক্ষিত স্বর্গের ‘ভাস্করের’ অশ্ব মর্ত্যের ‘ভাস্করের’ হাতে নিশ্চল, গতিহীন, পাণাণ!

সহস্রাঙ্ক বলেন, এই যদি হয় তোমার বক্তব্য, দেবদ্বন্দ্ব, তবে এ মূর্তিটিকেও আমি নিয়ে যাব কোপার্ক-ক্ষেত্রে। সে মন্দিরের দক্ষিণদ্বারে স্থায়ী আসন পাবে বিশ্বকর্মা মহাপাত্রের এই মূর্তিটি। পৃথিবী দেখুক, ভাবীকাল জানুক—স্বর্গীয় ভাস্করের অশ্ব কীভাবে গতিহীন হয়েছে পার্থিব ভাস্করের হাতে।

দেবদ্বন্দ্ব বলে, তথাস্তু।

মহামাতা সহস্রাঙ্ক তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। দেবদিল্লের স্বহস্তে গড়া বিশ্বকর্মার মূর্তিটি আজও আছে কোণার্ক জগমোহনের দক্ষিণদ্বারে, যদিও সে- মূর্তি কী জানি কেমন করে মুণ্ডাইনি।

দেবদিল্লও রেখেছিল তার প্রতিশ্রুতি। নিরলস পরিশ্রমে সে কাজ করে গেছে কোনার্ক। কে জানে হয়তো সেও কালে হয়েছিল প্রৌঢ়, বৃদ্ধ এবং অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল অর্কতীরেই। কোণার্ক জগমোহনের উপর-পোতালে তার হাতের কাজ আজও দেখতে পাবেন ; বুঝতে পারবেন না, সে মূর্তিগুলি তল-পোতালের ভাস্করের হাতে গড়া নয়। পুত্রের হাতে পরাজয়ই নাকি পিতার কাম্য। স্বর্গ থেকে তাই তৃপ্ত হয়েছিলেন বিশ্বকর্মা মহাপাত্র। হয়েছিলেন কি?

বৃদ্ধ গাইডকে থামিয়ে দিয়ে আমি প্রশ্ন করেছিলাম : আর লক্ষ্মী? তার কী হল? দেবদিল্লের নিরলস পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ মহারাজ কী তাকে তার সোনার অঙ্গ সোনা দিয়ে সতিহই মুড়ে দেননি?

জ্ঞান হেসে বৃদ্ধ বলেছিল, মহামাতা কী তাঁর কথার খেলাপ করতে পারেন, বাবুজী? আশীর্বাদ হয়ে যাওয়া কন্যার অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারেন? মহারাজের আদেশে তিনি সতিহই স্বর্ণালঙ্কারে মুড়ে দিয়েছিলেন সূতনুকাকে।

—মানে লক্ষ্মীকে?

—না বাবুজী! লক্ষ্মীকে আর কেউ কেন্দিনি দেখেনি। মহামাতার মতো মহারাজও বলেছিলেন, এমন সুলক্ষণা সূতনুকার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব। লক্ষ্মীর লৌকিক বিবাহ হয়নি। জানি না, কে তার ‘অভিষেক’ করেছিলেন—বৃদ্ধ নরসিংহদেব লাক্ষ্মিনা অথবা লালসাজ্জর পুরোহিত সহস্রাঙ্ক। কিন্তু সে অস্তিত্বে হয়েছিল কোণার্ক মন্দিরের রুদ্ধগনিকা। অলঙ্কার! মজা এই, রাজ্যদেশে দেবদিল্লকেই গড়তে হয়েছিল সেই সূতনুকার মূর্তি। তার ছবিই তো আঁকলেন এতক্ষণ সারা দুপুর ধরে।...

স্বীকার করি, এই কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। এ শুধু মুখে মুখে চলে আসা উপকথা। তবু মন চায় বিশ্বাস করতে—যেন তাহলেই ঐ নারী মূর্তির এই ভাবব্যঞ্জনার হৃদিস মেলে।

ওর চোখে কোন মাধী শুক্লা সপ্তমীর কুয়াশা-ঢাকা রহস্য। পিগম্যালিয়ানের মতো প্রাপ্তের সবটুকু আকৃতি উজাড় করে গড়েছে বলেই দেবদিল্ল এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও আবার গড়তে পেরেছে তার সূতনুকার আলেখ্য—

পাথর তো নয়, এ মূর্তি যে প্রেম দিয়ে গড়া।



যদিও সাধারণভাবে বলা যায় উত্তর-ভারতের চেয়ে দক্ষিণাত্যেই দেবদাসী প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তবু ইতিহাসের সমস্ত পর্যায়েই উত্তর ভারতে এই দেবদাসীদের নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখা গেছে।

খ্রীষ্ট পূর্ব যুগের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কথা ইতিপূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাৎসায়নের কামশাস্ত্র যদি তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের রচনা হয়, তবে মেনে নিতে হবে কৌটিল্য থেকে বাৎসায়নের যুগে তাদের ভাগ্যের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। বাৎসায়ন ছয়-

ছয়টি অধ্যায় ব্যয় করেছেন বারবণিতাদের জন্য। লক্ষণীয় উভয়েই দেবদাসী শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেননি। যেন সে দায় পুরোহিতকুলের।

এরপর আসে দত্তীর ‘দশকুমার চরিত’ এ কামমঞ্জুরীর উপাখ্যান। কামমঞ্জুরী কিন্তু দেবদাসী নয়, জনপদবধু। কামমঞ্জুরী সখীর সঙ্গে বাজি ধরে যে, ছলাকলায় সে জিতেদ্রিয় ঋষি মারিচকে বশ করবে। ‘মারিচ’-কে চিনতে পারলেন তো? উত্তরাকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডলের অন্যতম ঋষি। সখীর মনে হয়েছিল, সেটা অসম্ভব; বলেছিল, ‘তা যদি পারিস তবে তোর দাসী হয়ে থাকব।’ দুর্ভাগ্য বেচারির। দাসীত্ব তাকে স্বীকার করতে হয়েছিল; কারণ কামমঞ্জুরী তার ছলা-কলা-অভিনয়ে ব্রহ্মচারীকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছিল।

“শুণ্য যুগে পাছি কালিদাসের বর্ণনা :

‘পাদন্যাসৈঃ কনিতবশনাস্ত্র লীলবধূতৈঃ

রত্নস্বঃপ্রাখচিতবলিভিচ্চামরৈঃ ক্লাস্তহস্তাঃ ।

বেশ্যাস্ত্রস্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দু

নামোল্যন্তে ক্ষয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘাণান্ কটাক্ষান ॥^১

“সেখানে বেশ্যারা চরণক্ষেপে মেখলা স্নানিত করে নীলাসহকারে ক্লান্ত হস্তে রত্নপ্রভামণ্ডিতদণ্ডচামর দোলাবে। তাদের অঙ্গের নখক্ষতে তোমার (মেঘের) সুখস্পর্শ নবজলবিন্দু পতিত হলে তারা তোমার প্রতি ভ্রমরশ্রেণী তুল্য দীর্ঘ কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করবে।”^২

কালিদাসের এই শ্লোকটিতে অনুমান করতে পারি—কেন কৌটিল্য বা বাৎসায়ন ‘দেবাদাসী’দের প্রসঙ্গে নীরব। বোধকরি ‘দেবাদাসী’ ও ‘বেশ্যা’ শব্দ দুটি সে আমলে সমার্থক বলে ধরা হত। কালিদাস-বর্ণিত মহাকাল মন্দিরে যে মেয়েটি ক্লান্তহস্তে চামরবাদনরত সে সন্দেহাতীতরূপে ‘দেবাদাসী’—নটী, জনপদবধু বা বারাদাসা বলতে যা বুঝি ঠিক তা নয়। কিন্তু কালিদাস সেই মেয়েটিকে অভিহিত করেছেন—‘বেশ্যা’ নামে। ঐ শব্দটির বর্তমানে যে যোগরূঢ় অর্থ—গালিবিশেষ—তা সে আমলে প্রচলিত ছিল না; নচেৎ কালিদাস এই মনোরম বর্ণনায় শব্দান্তরের আশ্রয় নিতেন।

দামোদর গুপ্ত ছিলেন কাশ্মীরাদিপতি জয়্যাপীড়ের মন্ত্রী। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। তাঁর ‘কুট্টনীমতম্ কাব্যম্’ পাঠে জানতে পারি দেবাদাসীদের বাঁধা মাহিনা ছিল এবং জীবিকাটি ছিল আবশ্যিকভাবে বংশানুক্রমিক। অর্থাৎ দেবাদাসীর কন্যা না চাইলেও তাকে হতে হবে দেবাদাসী। দামোদর ভট্ট পড়ে মনে হয় কাশীর বিষ্ণুনাথ মন্দিরেও সে আমলে দেবাদাসী বাহিনী ছিল।

এর দু-তিনশ বছর পরে উত্তরখণ্ডে রচিত হয়েছিল আরও দুটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ কল্যাণমন্দের ‘অঙ্গরঙ্গ’ এবং ক্ষেমেন্দ্রনাথের ‘শ্যামামাতৃকা’। এঁরা দুজনেই কাশ্মীরী। ক্ষেমেন্দ্র হচ্ছেন ‘কথাসরিৎ-সাগর’ রচয়িতা সোমদেবের প্রায় সমসাময়িক। তাঁর রচনায় দেবাদাসী প্রথার অর্থাৎ ধর্মের অভ্যুত্থানে নারীদেহ ভোগের নিন্দা করা হয়েছে। উড়িষ্যার মুক্তেশ্বর মন্দিরের নির্মাণ কাল আনুমানিক ৯৫০ খ্রীস্টাব্দে। মন্দিরে উৎকীর্ণ করা একটি লিপিতে জানা যাচ্ছে, পন্থব-মহিষী ধর্মমহাদেবীর আমলে চুয়ান্নিশ জন দেবাদাসী ঐ মন্দির থেকে মাসিক বেতন পেতেন। মজা এই, ধর্মমহাদেবী রাজমহিষী ছিলেন না; ছিলেন সিংহাসনের অধিকারিণী—সুলতানা রিজিয়া বা কুইন ভিক্টোরিয়ার মতো। শুধু তিনি একা নন, ঐ রাজবংশে পর পর চারজন রমণী অতি স্বল্প কালের জন্য হলেও কলিঙ্গের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। এবং তাঁরাও মন্দিরে দেবাদাসী উৎসর্গ করে স্বর্গে যাবার সিঁড়ি বানাতে চেয়েছেন।^৩ তাঁরা তো কাক নন যে কাকের মাংস খাবেন না!

বঙ্গদেশেও মন্দিরে মন্দিরে ছিল দেবাদাসী। ছিটেফোঁটা পোড়ামাটির ভাস্কর্যে হয়তো তাদের দেখেছেন; কিন্তু তাদের বর্ণনা অক্ষয় হয়ে আছে সে আমলের রচনায়। সঙ্ঘ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিত’ কাব্যে রামাবতী নগরীর মন্দিরে বারবণিতাদের রূপবর্ণনা করা হয়েছে।

তারা ছিল নৃত্যগীতপাটিয়সী, সুন্দরী ও সুতনুকা।

কশ্যপ্তের একটি শ্লোক উদ্ধার করে দেখিয়েছেন আরতি গঙ্গোপাধ্যায় ^৪ :

“বাসং সূক্ষ্মং বপুষি ভূজিযোঃ কাঞ্চনী চান্দ্রদত্ৰী

মালিগর্ভঃ সুরভি মসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।

কর্ণোত্তংসে নবশশিকলানির্মলং তালপত্রং

বেশঃ কেবাং না পুরতি মনো বঙ্গ বারান্দানাম্।।”

“দেহে সূক্ষ্ম বসন, ভূজবন্ধে সুবর্ণ-অঙ্গদ, গন্ধতৈলসিক্ত মসৃণ কেশদাম মাথার উপর শিখণ্ড বা চূড়ার আকারে ঘননিবদ্ধ, তাতে ফুলের মালা জড়ানো। কর্ণে নবশশিকলার মতো নির্মল তালপত্রের আভরণ—বঙ্গ-বারান্দাদের এই বেশ কার না মনোহরণ করে?”

উত্তর ও মধ্যভারতের মতো পশ্চিম-ভারতেও দেবদাসী-প্রথার সন্ধান বাবে বাবে পাওয়া যাচ্ছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে চীন-আরব বাণিজ্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে চৈনিক পর্যটক চৌ জু-কুয়া কথাগুলো ভারতবর্ষের দেবদাসীর প্রসঙ্গে এসেছেন। বলেছেন, গুজরাতে সে আমলে প্রায় চার হাজার বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল এবং সে সব মন্দিরে নর্তকীর সংখ্যা কুড়ি হাজার অর্থাৎ প্রতি মন্দিরে গড়ে পাঁচ জন দেবদাসী। চীনা পর্যটক লিখেছেন—এতে অবাক হবার কিছু নেই, কাশ্মীরের মন্দিরেও আছে ঐ জাতের নর্তকীদল।^১

সপ্তদশ শতকের যুরোপীয় পর্যটক ট্যাভিনিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন, হায়দ্রাবাদের কাছে গোলকুণ্ডায় অন্তত বিশ হাজার রূপোপজীবিনীর বাস ছিল। প্রতি শুক্রবারে তারা রাজার সামনে নৃত্যপ্রদর্শন করত। ‘শুক্রবারটা’ লক্ষ করার মতো—সেটা জুম্মাবার। বস্তুত নিজামের এলাকায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নর্তকীরাই বংশপরম্পরায় এ কার্যে ব্রতী হত। হিন্দু জনপদবধূরা হয়তো পূর্ববর্তী জমানায় ছিল মন্দিরের দেবদাসী—মুসলমান নর্তকীদের মধ্যেও অনেকে তাই। তারা ইতিমধ্যে ধর্মান্তরিতা হয়েছে। এদের লৌকিক বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। হিন্দু হলে বিবাহ হত শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সঙ্গে, মুসলমান হলে তরবারির সঙ্গে! বোম্বাই অঞ্চলে এরাই ছিল ‘ভাকিন’।

উত্তর ও মধ্যভারতে দেবদাসী প্রথার প্রসার দাক্ষিণাত্যের তুলনায় নিশ্চয় কম; তার হেতু হিসাবে অনেকের অভিমত—মুসলিম অভিযান। উত্তরবঙ্গে এরপর দেবদাসী সীমিত হলেও নাচনোগ্রাণীর অভাব কোনদিনই হয়নি। আকবর থেকে শাহজাহাঁ পর্যন্ত মুঘল জমানায় তারা ছিল আবশ্যিক। আবুল ফজল তো লিখে গেছেন দিল্লীর একটা অঞ্চল নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ওদের জন্য। এলাকাটার নাম দেওয়া হয়েছিল—‘শয়তানপুর’।

মুঘল জমানায় এই বে নৃত্যগীতপাটিয়সীদের রব্বা তার অবসান ঘটল শেষ গ্রাউ-দেবদাসী ৭৪

মুঘল-এর আমলে। ঔরঙ্গজীব আইন করে বন্ধ করে দিলেন নৃত্যগীতের আসর। অতঃপর মুঘল-কিল্লার ভিতর এ সব অনাচার আর চলবে না। বাইরে যা হয় হোক। খাফি খান কৌতুকমিশ্রিত বর্ণনায় সেই বিষাদ-সঙ্গীতটি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন :

“সেদিন শুক্রবার জুমা মসজিদের পথে হঠাৎ বাদশাহ আলমগীরের নজর পড়ল হাজার হাজার গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী রাশি রাশি শবাধার বহন করে চলেছে। বাদশাহ জ্ঞানতে চাইলেন—“ওরা কে? কাঁধেই বা কে?” উত্তর হল—“দেহরক্ষা করেছে সঙ্গীত, সেই সঙ্গীত যিনি তাবৎ নাচেনওয়ালীর জননী।” উত্তর দিলেন সম্রাট—“সুসংবাদ বটে। ভাল করে কবর দেওয়া চাই।”^৬

কারণ যাই হোক একথা স্বীকার্য যে, উত্তরাপথের চেয়ে দাক্ষিণাত্যে দেবদাসীপ্রথা ব্যাপক আকার ধারণ করে ; এবং সেখানে অন্ধবিশ্বাস আরও জাঁকিয়ে বসে। মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গ করলে স্বর্গে যাওয়া সহজ এই মতটা সেখানে দৃঢ়মূল হয়েছিল। যারা দেবদাসী সরবরাহ করত বা ক্রয় করত তাদের বিষয়ে সমাজ ছিল নীরব দর্শক। দাক্ষিণাত্যে দেবদাসীর সমাদর সবচেয়ে বেশি মাদ্রাজ, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরে।

দক্ষিণে প্রাচীনতম তাম্রশাসনটি খ্রীস্টীয় ১০০৪ অব্দের। চোল বংশের নৃপতি রাজারাজ্ঞ জানাচ্ছেন যে, তিনি তাম্রোলের বিখ্যাত শিবমন্দিরে সুশিক্ষিত চারশত “তেলিচেরি পোস্তগাল” বা দেবদাসী দান করেছেন। তাদের জন্য মন্দির সন্নিকটে বাসগৃহও নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন।

প্রায় বহুর পঞ্চাশ পরে খান্দেশের ভাগলি নামক স্থানে প্রাপ্ত আর একটি শিলালিপি পাঠে জানা যাচ্ছে রাজা গোবিন্দদেব মন্দিরে নর্তকীদের ব্যবস্থা করছেন। তাদের ভূসম্পত্তি দান করছেন। এর প্রায় ত্রিশ বছর পরে, ১০৯০ খ্রীস্টাব্দে চম্বন-রাজা খোজলা দেব আদেশ জারি করছেন—উৎসবের দিনে নর্তকীদের মনোহর নৃত্যে যদি কেউ বিস্ময় সৃষ্টি করে তবে তাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া হবে।^৭ এই শেবোক্ত ঐতিহাসিক স্মৃতিটির অপর একটি মূল্য আছে। এটি পাঠে মনে হয়—সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণী এই দেবদাসী প্রথায় বুশি নয়। সেই শ্রেণীটি নিরন্ন, নিরক্ষর গ্রামবাসী নয়, যাদের ঘর থেকে দেবদাসীদের নানান কায়দার সংগ্রহ করা হত ; কারণ সেক্ষেত্রে রাজার পক্ষে শিলালিপি লেখার প্রয়োজন ঘটত না—এ সাবধানবাণী সাক্ষর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন এক শ্রেণীর লোকের জন্য। এ থেকেই অনুমান করছি, রাজা-শ্রেষ্ঠী শ্রেণী এবং বলাবাহুল্য পুরোহিত-ব্রাহ্মণেরা এ প্রথার স্থায়িত্ব কামনা করলেও একটি বিরুদ্ধবাদী জনমত—নিঃসন্দেহে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজহিতৈষী দলের জনমত—সম্মুখারার মতো প্রবাহিত ছিল। আলবেরুণিও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখে গেছেন—“হিন্দুদের একাংশ এই মন্দির নর্তকীদের উচ্ছেদের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। কিন্তু সফল হতে পারেনি।”

মাত্র গত শতাব্দীর কথা : ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ। যুরোপে তখন পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের

একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে জোসেফিন বাটলারের নেতৃত্বে। কেউ কেউ বলেছেন, সেই আন্দোলনের ঢেউই এসে পৌঁচেছিল ভারতবর্ষে—ইংরেজের উপনিবেশের এই দেশে। কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। জোসেফিন এলিজাবেথ রাসেল যে ব্যবস্থাপনা করতে চেয়েছিলেন তা পতিতাবৃত্তির উচ্ছেদের জন্য নয়। ঐ বাঁকা পথে ইংলন্ডে, তথা যুরোপে সমুদ্রপথে যে ভয়াবহ দুটি রোগ অনুপ্রবেশ করছিল—গনোরিয়া ও সিফিলিস, তার উচ্ছেদ হয়নি— হয়েছিল “Contagious Diseases Acts” “which placed the loose women in seaports and military towns under police jurisdiction, often subjecting them to much injustice.”

ইংরেজ শাসনের সময়ে ভারতবর্ষে প্রসঙ্গটা প্রথম আসে ১৯০৬-১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে। ভারত-সরকারকে ঐ সময় একটি আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করতে হয়, যার বিষয়বস্তু ছিল : পতিতাবৃত্তি। প্রসঙ্গত এল ইংরাজ উপনিবেশে পতিতাবৃত্তির কথা এবং সেই সূত্র ধরে এই অদ্বিতীয়া বারবণিতার প্রসঙ্গ : দেবদাসী। এ কৃতিত্ব হরি সিং গৌর-এর। তিনিই একটি মেমোরেন্ডাম পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ সরকারকে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে বলেন। তা বিবেচনা করতে সময় তো লাগবেই। দেখা গেল প্রসঙ্গটি আবার উত্থাপিত হয়েছে ১৯১২ সনে, সেই যে বছর কলকাতা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে দিল্লীতে স্থাপন করা হল। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে পর-পর তিনখানি ‘বিল’ উত্থাপিত হল। তাদের জনক মানেকজী দাদাভাই, আঞ্চলিকার এবং মাড়্গে। সরকার জবাব দিলেন—দেবদাসী প্রথার সঙ্গে দক্ষিণ ভারত বিশেষভাবে জড়িত। এ বিষয়ে কোনও আইন প্রণয়নের পূর্বে সে অঞ্চলের জনগণ কী চায় তা জানা দরকার। ‘জনগণ’ বলতে সে-আমলে বোঝাতো সে অঞ্চলের রাজা-মহারাজা-নবাব এবং তাদের ছত্রছায়ায় যাঁরা করে থাকেন। যাই হোক, ঐদের মতামতের উপর ভিত্তি করে নিযুক্ত হল একটি কেন্দ্রীয় সিলেক্ট কমিটি। সেটা পরের বছর, ১৯১৩ সনে। সিলেক্ট কমিটি বিচার বিবেচনা করে তাঁদের মতামত জানানোর পরের বছর, মার্চ মাসে। কিন্তু তার সওয়া বছরের মধ্যে—ছাষিশে জুন ১৯১৪ তারিখে, সারাজেভোতে প্রিন্সেপ্-নামে একজন সার্বিয়ান ছাত্র বেমকা খুন করে বসল সন্ত্রাস্ত্রিক অস্ট্রিয়ান আর্চ-ডিউক ফার্ডিনান্ডকে। ঘটনাটা অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছে তো? তা তো হবেই—বহু দশক পার হয়ে গেছে যে। কিন্তু ঐ সামান্য ঘটনা থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রাণ দিল—চার বছর ধরে সমগ্র পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ। ফলে, ভারত সরকারের জরুরী ফাইলের তলায় দেবদাসীর ভাগ্যবিজড়িত ঐ ফাইলটি চাপা পড়ে গেল।

শোনা যায়, একজন অভিজ্ঞ সিভিলিয়ান ঐ সময় বলেছিলেন, আইন প্রণয়ন করে এ প্রথা রোধ করার আগে ভেবে দেখুন—ঐ দেবদাসীদের উদ্ধার করা হলে তাদের কোথায় আশ্রয় দেবেন—তারা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে?

এ প্রশ্নটি অনেকে নিশ্চয় ভেবেছিলেন; কিন্তু তার সমাধানের কোনও বাস্তব প্রচেষ্টা নজরে পড়ে না। কিন্তু ইতিহাস বলছে, ১৯২২ সনে হরি সিং গৌড় বোম্বাই বিধানসভায় পুনরায় একটি প্রস্তাব পেশ করেন। বোম্বাই বিধানসভার বেশ কিছু প্রভাবশালী সদস্য এজন্য হরি সিং গৌরকে ভরৎসনা করেন। এমনকি তাঁকে ‘অহিন্দু’ বিশেষণে বিভূষিত করা হয়।

বছর পাঁচেক পরে দেখছি, কেন্দ্রীয় পরিষদে রামদাস পানতুলু উপস্থিত হয়েছেন। একই জাতের প্রস্তাব নিয়ে।

দুটি প্রস্তাবই গৃহীত হল; কিন্তু আইন পাশ হল না কোথাও।

ইতিমধ্যে (১৯২৭) সারদা-আইন পাস হয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ক্ষেত্রে আইনের নির্দেশ কঠোরভাবে বলবৎ হওয়ায়, অভিভাবকরা আর আঠারো বছরের কমবয়সী মেয়েদের নিয়ে আসেনা মন্দিরে, পুরোহিতের দলও বয়সের হিসাবটা খতিয়ে দেখে। যেন ‘আঠারো বছর’ বয়সটাই সব কিছুর শেষ কথা। নিঃসন্দেহে তা একটা বড় কথা। অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হল; কিন্তু দেবদাসী-প্রথা বন্ধ হল না।

হরি সিং গৌর ছাড়া এ আন্দোলন নিয়ে কাজ করছিলেন মাদ্রাজের ডঃ মিসেস মুখুলক্ষ্মী রেড্ডী। মাদ্রাজ বিধানসভায় বস্তুত তিনিই প্রথম এই বিলটি উত্থাপন করে ‘দেবদাসী-প্রথা’ উচ্ছেদের দিকে একটি বড় জাতের পদক্ষেপ করেন। তারিখটা শুক্রবার, চৌঠা নভেম্বর উনিশ শ সাতাশ।

তার প্রচেষ্টাতেই আন্দোলনটি সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। আনি বেসান্ত এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বিরুদ্ধবাদীদের একটি ‘চ্যালেঞ্জ থ্রো’ করলেন সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে : “কেউ কি আমাকে দেখাতে পারেন হিন্দুর কোনও ধর্মশাস্ত্রে দেবদাসীর বিধান আছে?”

কোনও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাঁর সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি।

ঐ সময় মহাত্মাজী দক্ষিণ ভারত প্রদক্ষিণ করেন। বিভিন্ন জনসভায় এবং সংবাদপত্রে তিনি এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। মিস্ মেয়োর ‘মাদার ইন্ডিয়া’কে ভারতবাসী মায়েই গালমন্দ করেন; কিন্তু ‘ডেভিল’ কে যদি তার ‘ডিউ’ দিতে হয় তবে স্বীকার করতে হবে—ঐ গ্রন্থের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কিছু কাজ হয়েছিল। যাঁরা চাইছিলেন দেবদাসী প্রথা অব্যাহত থাক—সেই যাঁরা হরি সিং গৌরকে ‘অহিন্দু’ বলে গাল পেড়েছিলেন—এখন তাঁরা নীরব থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। কারণ মিস্ মেয়োর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অন্যতম লক্ষ : দেবদাসী প্রথা।

ডঃ মিসেস মুখুলক্ষ্মী রেড্ডী দীর্ঘদিন—বলতে গেলে প্রায় একাই—এই প্রথাটির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। বিশের দশক থেকে প্রায় পঞ্চাশের দশক। সমগ্র

দক্ষিণাত্যে তিনি আন্দোলন চালান। জনসভায়, বিশেষ করে মন্দিরের প্রবেশ-পথে এ জাতীয় সভাসমিতিতে ক্রমে জনমত গড়ে ওঠে। পত্র-পত্রিকায় নানান বিদগ্ধ লেখক তাঁর এ শুভ প্রচেষ্টায় মদত দিতে থাকেন। পুরোহিত, মন্দির-কর্তৃপক্ষ এবং তাদের পিছনে ছিলেন যে সব পৃষ্ঠপোষক, তাঁরা ক্রমেই হাল ছেড়ে দিতে থাকেন। প্রথমে মহীশূর রাজ্যে, পরে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ সরকার বিপুল জনমতের চাপে দেবদাসী প্রথা রদ করার স্বপক্ষে আইন প্রণয়ন করেন। শ্রীমতী রেড্ডী সেদিন সানন্দে ঘোষণা করেন—“I am glad that this time-old Devdasi System in the Hindu temples as well as dedication of girls to Hindu idols have been totally abolished by two measures, Act No.V of 1929 and Prevention of Dedication Act of 1949.” [আমি আজ আনন্দিত, কারণ দীর্ঘকালের দেবদাসী প্রথা এবং মন্দিরে হিন্দু মেয়েদের উৎসর্গ করার প্রথা আজ সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হল।]

স্বাধীন ভারতসরকার তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ডক্টর মিসেস মুখুলক্ষ্মী রেড্ডিকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিতা করেন।

দেবদিন্ তরপর থেকে আর মূর্তি গড়ে না; গড়ে বিমূর্ত বিমূর্তি।

আর সুতনুকা?

ঠিক জানি না, শুনেছি—তারা মন্দিরের ঘৃতপ্রদীপজ্বলা আধো-অন্ধকারের রহস্য থেকে মুক্তি পেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতের বড় বড় শহরের লালবাতিজ্বলা চাকলাগুলিতে। কোন কোন সৌভাগ্যবতী অবশ্য সাগারপারে ইরান-তুরান অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছে। আবুধাবি, দুবাই বা ঐ জাতীয় তৈলাক্ত অঞ্চলে।

এটাও ঠিক জানি না, আন্দাজ করি নরসিংহদেব লাক্ষুলিয়ার মতো আরব শেখরাও হয়তো তাদের সর্বাঙ্গ মুড়ে দিয়েছে বুটো হীরে-মণি-মুক্তায়! শেখ-হারেমে হয়তো তারা নতুন করে বুটো-‘অলঙ্কার’ হয়েছে।

pathagat.net

তথ্যসূত্র ও নির্দেশিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ।।

- 1 (পৃ: ৯)*The Wonder That was India*, Dr, A.L.Basham, Sidgawick & Jackson, London 1954, p.185
- 2 (পৃ: ১১)....কামসূত্র, বাৎসায়ন, প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় স্কন্ধ
- 3 (পৃ: ১২)....*Prostitution, Encyclopedia Britannica*
- 4 (পৃ: ১২)....*Prostitution, Oxford English Dictionary*
- 5 (পৃ: ১৩)....*Herodotus*, Bk. I, p. 199
- 6 (পৃ: ১৩)....*Socrates, Ecclesiastical History*, Bk. XVIII
- 7 (পৃ: ১৩)....*Sozomon, Eccles. Hist Bk. V. p.10*
- 8 (পৃ: ১৩)....*Geography, Strabo*, vol.II, pp. 14-16
- 9 (পৃ: ১৪)....‘সেতু’, শরদ্বীপ বন্দোপাধ্যায়
- 10 (পৃ: ১৪)....*The City of Gods*, St.Augustine, Bk. IV, p.10
- 11 (পৃ: ১৫)....op, cit, Basham
- 12 (পৃ: ১৬)....Salmon Reinach
- 13 (পৃ: ১৭)....*The Malayasians of British Guiana*, by Seligman, Cam. Univ. Press, 1910, p.473
- 14 (পৃ: ১৭)....*The Origin of the Faminy, Private Property and the State*, Engels, F., Progress Publishers, Moscow, 1948, p. 52
- 15 (পৃ: ১৭)....*The Stew and the Strumpets*, Henriques
- 16 (পৃ: ১৭)....op.cit, Engels, p.51
- 17 (পৃ: ১৯)....Ibid, p. 58
- 18 (পৃ: ২২)....‘জয়দেব’, অভিধান, সুবলচন্দ্র মিত্র

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।।

- 1 (পৃ: ২৪)....মেঘদূতে-বর্ণিত বিদিশা-নগরীর অনতিদূরে বর্তমান ‘সাঁচী’র নাম মৌর্যযুগে ছিল ‘কাকন্য’, *Sanchi*, The Publications Divn, Govt. of India Jan '60, p.5.
- 2 (পৃ: ২৪) ...বুদ্ধদেবের ‘250০-বর্ষ পূর্তি উৎসবের প্রারম্ভিক বক্তৃতায় মহাশয়ের ভাষণ অনুসারে সাঁচীর বৃহত্তম-স্থূপে রক্ষিত আছে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের পুতাস্থি, যা মগধরাজ বিম্বিসার কুশীনগর থেকে সংগ্রহ করে এনে প্রথমে নিজ রাজধানীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সম্রাট অশোক স্বয়ং সেটি সাঁচীতে স্থানান্তরিত করেন।